জুল ভার্নের

সাগর তলে

রূপান্তর: শামসুদ্দীন নওয়াব

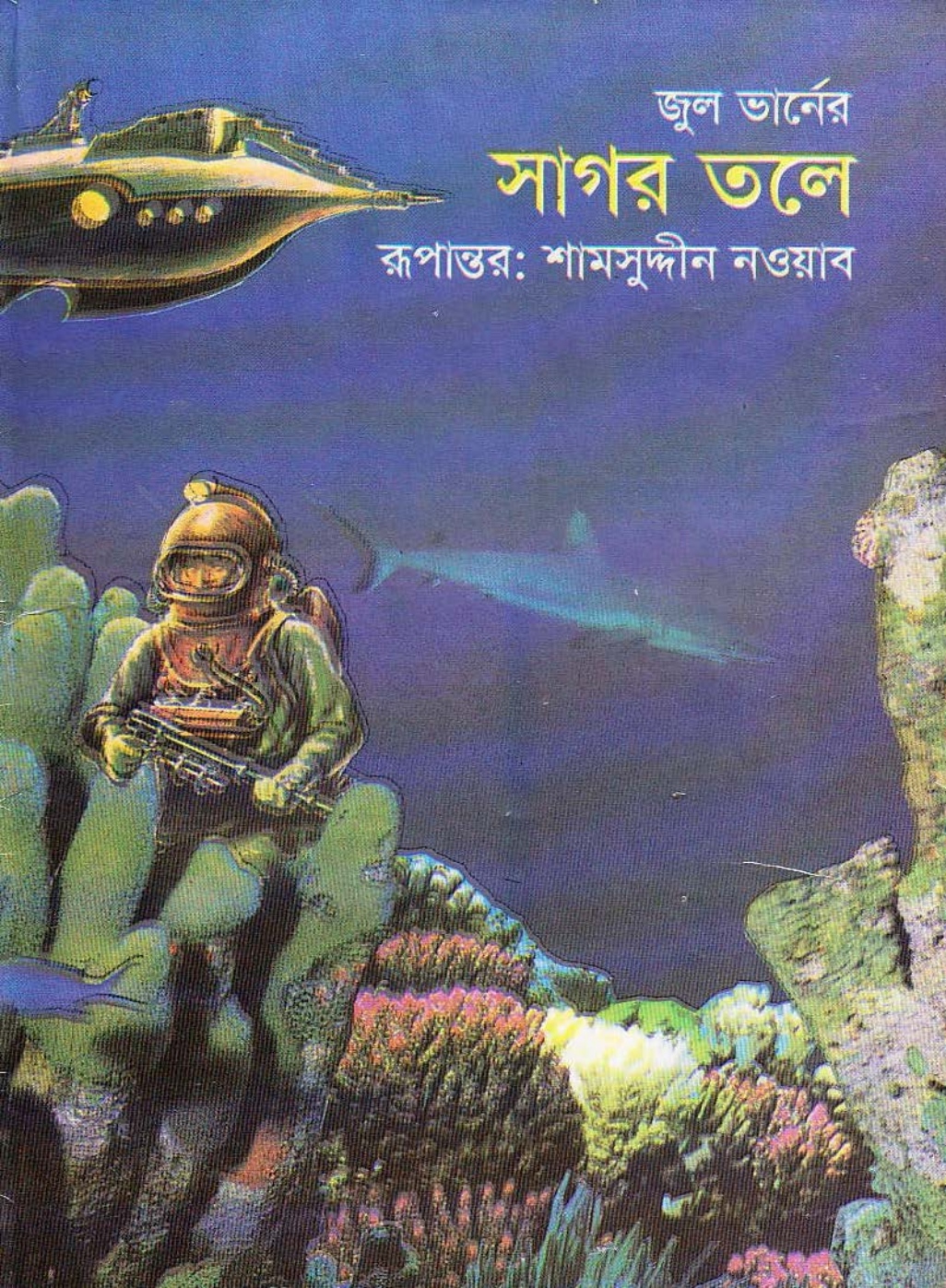

জুল ভার্নের
বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী

সাগর তলে

রূপান্তর
শামসুদ্দীন নওয়াব

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনুর হোসেন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব: অনুবাদকের
প্রথম প্রকাশ
সেবা প্রকাশনী: ১৯৭৮
প্রজাপতি সংস্করণ; ১৯৯৬
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

TWENTY THOUSAND LEAGUES UNDER THE SEA
By: Jules Verne
Trans. By: SHAMSUDDIN NAWAB
ISBN-984-462-648-x
মূল্য: এক শ' দশ টাকা

সাগর তলে

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

প্রজাপতি প্রকাশনের আরও ক'টি অনুবাদ

ফ্রেড জিপসন
শিকারি পুরুষ
ওল্ড ইয়েলার
মার্ক টোয়েন
দুঃসাহসী টম সয়্যার
গোয়েন্দা টম সয়্যার
নভোচারী টম সয়্যার
হাকলবেরি ফিন
ফার্লে মোয়াট
তিমির প্রেম
রবার্ট লুই স্টিভেনসন
ট্রেজার আইল্যাণ্ড
ড. জেকিল অ্যাণ্ড মি. হাইড
কালোতীর
রবার্ট লুই স্টিভেনসন ও জর্জ ইলিয়ট
বোতল শয়তান ও সাইলাস মারনার
রবার্ট মাইকেল ব্যালান্টাইন
প্রবাল দ্বীপ
গরিলা শিকারী
আর্নস্ট হেমিংওয়ে
দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী
হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড
সলোমনের গুপ্তধন
ড্যানিয়েল ডিফো
রবিনসন ক্রুসো
জ্যাক লণ্ডন
সী উল্‌ফ্‌
দ্য কল অভ দ্য ওয়াইল্ড
জেরোম কে জেরোম
ত্রিরত্নের নৌ-বিহার
ব্যারোনেস ওর্কজি
দ্য স্কারলেট পিম্পারনেল
জেমস হিলটন
লস্ট হরাইজন
পার্ল এস. বাক
দ্য গুড আর্থ
আলেকজান্ডার ডুমা
তিন মাস্কেটিয়ার
রাফায়েল সাবাতিনি
ক্যাপ্টেন ব্লাড
অ্যানটনি হোপ
জেণ্ডার বন্দী
জেমস ফেনিমোর কুপার
দ্য লাস্ট অভ দ্য মোহিকান্স
দি প্রেইরি
চার্লস ডিকেন্স
আ ক্রিসমাস ক্যারল
নিকোলাস নিকলবি
আর. ডি. ব্ল্যাকমোর
লর্না ডুন
জোসেফ কনরাড
লর্ড জিম
এরিখ কেস্টনার
এমিলের গোয়েন্দা দল
পিটার টিমেন
রক্তবীজ
এইচ.জি.ওয়েলস
টাইম মেশিন
এরিক মারিয়া রেমার্ক
অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট
সাইলাস হকিং
হার বেনি

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

১৮৬৬ সাল। শুধু সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোই নয়, গোটা দুনিয়ার অগণিত মানুষ—বিশেষ করে নাবিকেরা, চমকে উঠেছিল খবরটা শুনে। কিছুদিন ধরে নাকি জাহাজের লোকেরা অদ্ভুত এক অতিকায় প্রাণীর দেখা পাচ্ছে গভীর সমুদ্রে। তিমির চেয়ে অনেক বড় আর অস্বাভাবিক দ্রুত গতিসম্পন্ন ওই প্রাণীটার গড়ন লম্বাটে, মুখটা ছুঁচাল। রাতের বেলা এর পিঠের উপর জ্বলে ওঠে ফসফরাসের মত উজ্জ্বল আলো। কেউ বলে দৈর্ঘ্যে এটা দুশো ফুট আবার কারও মতে মাইল তিনেক, প্রস্থে এক থেকে দেড় মাইল।

এই বছরেরই ২০ জুলাই ক্যালকাটা অ্যাণ্ড বার্ণাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির 'গভর্নর হিগিনসন' নামে একটা জাহাজ অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে দেখল ওই আজব সচল বস্তুটাকে। স্থির হয়ে পড়ে থাকতে দেখে জাহাজের ক্যাপ্টেন বেকার প্রথমে এটাকে বালিয়াড়ি ভাবলেন। কিন্তু একটু পরই পিঠ থেকে প্রচণ্ড শব্দে দুটো পানির ধারা শূন্যে নিক্ষিপ্ত করে ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল ওটা গভীর পানিতে।

তিনদিন পর প্রশান্ত মহাসাগরে ঠিক একই দৃশ্য দেখল 'কলম্বাস' নামে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড প্যাসিফিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির আর একটা জাহাজ। ক্যাপ্টেন বেকারের দেখা জায়গা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এ এলাকার দূরত্ব ২৪৫০ নটেরও (সামুদ্রিক মাইল) বেশি। এ থেকেই আন্দাজ করা যায় কত দ্রুত চলতে পারে প্রাণীটা।

পনেরো দিন পর, 'হেলভেশিয়া' ও 'শ্যাননন' নামে দুটো জাহাজ আরও দু'হাজার মাইল দূরে আটলান্টিকে দেখল এটাকে। দুটো জাহাজের ক্যাপ্টেনই অনুমান করলেন লম্বায় সাড়ে তিনশো ফুটের মত হবে প্রাণীটা। অথচ পৃথিবীর সবচে বড় প্রাণী নীল তিমির দৈর্ঘ্যও সাধারণত নব্বই ফুটের বেশি হয় না।

তারপর প্রায় দু'বছর আর পাত্তা নেই। ঘটনাগুলো সবাই ভুলতে বসেছে ঠিক এমনি সময়, ১৮৬৮ সালের গোড়ার দিকে আবার দেখা দিল দানবটা। তবে এবারে আর দেখা দিয়েই ক্ষান্ত হলো না। জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসল সে। ৫ মার্চ রাতে 'মোরাভিয়ান' নামে একটা জাহাজ (২৭° ৩০ অক্ষাংশ ও ৭২°১৫ দ্রাঘিমাংশ) হঠাৎ শিলাখণ্ডে আটকে যেতে যেতে বেঁচে গেল। অথচ ওই এলাকার চার্ট খুঁজে শিলাখণ্ডের নামগন্ধও পাওয়া গেল না। অনুকূল বাতাস চারশো হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনের মিলিত শক্তিতে তেরো মাইল বেগে চলন্ত 'মোরাভিয়ানে'র তলাটা অত্যন্ত মজবুত না হলে ২৩৭ জন যাত্রী নিয়ে ওই সংঘর্ষেই ডুবে যেত।

দুর্ঘটনার সাথে সাথে জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা ডেকে ছুটে এলেন। জাহাজ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে সাগরের পানিতে একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণি ছাড়া আর কিছুই দেখলেন না তাঁরা। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল জাহাজ বুঝতে পারলেন না কেউ। পরে মেরামতের সময় দেখা গেল জাহাজের তলার দিকে একটা অংশ ভেঙে গেছে।

তিন সপ্তাহ পরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। দুর্ভাবনা দেখা দিল লোকের মনে। ওই বছরের তেরোই এপ্রিল দুর্ভাবনা পরিণত হলো আতঙ্কে। সমুদ্র শান্ত ছিল সেদিন। বাতাস অনুকূল, ১৫°১২´ দ্রাঘিমাংশ আর ৪৫°৩৭´ অক্ষাংশে বারো মাইল বেগে ছুটছে কুনার্ড কোম্পানির জাহাজ—স্কোশিয়া।

বিকেল চারটে বেজে পনেরো। জাহাজের বিরাট ডাইনিংরুমে যাত্রীরা পানভোজনে রত। ঠিক এমনি সময় কিসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় থর থর করে কেঁপে উঠল জাহাজ।

'ডুবে গেল, জাহাজ ডুবে গেল,' বলে চিৎকার করতে করতে নিচ থেকে কয়েকজন নাবিক ছুটে এল। ভয় পেয়ে গেল যাত্রীরা। অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদেরকে শান্ত করলেন ক্যাপ্টেন অ্যাণ্ডারসন।

'স্কোশিয়ার' জাহাজের গড়নটা একটু বিচিত্র। জাহাজের তলা সাতটা কক্ষে ভাগ করা। ক্যাপ্টেন নিচে নেমে এসে দেখলেন পাঁচ নম্বর কক্ষটা ফুটো হয়ে গেছে। হু হু করে পানি ঢুকছে সেখান দিয়ে। ইঞ্জিন ও বয়লারগুলো সে কক্ষে ছিল না বলে সে যাত্রা বেঁচে গেল জাহাজটা, কোনমতে ধুঁকতে ধুঁকতে পৌঁছল তিনশো মাইল দূরের কেপ ক্লিয়ার বন্দরে।

মেরামতের জন্যে ডকে তোলার পর জাহাজের তলা পরীক্ষা করে বিস্মিত হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারের দল। ত্রিকোণ একটা ছিদ্র জাহাজের তলায়। পরিষ্কার বোঝা গেল তীক্ষ্ণ, ধারাল কোন অস্ত্রের প্রচণ্ড আঘাতে ছিদ্র হয়ে গেছে মোটা লোহার পাতে।

খবর শুনে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হলো সারা পৃথিবী জুড়ে। সাধারণ অবস্থায়ও জাহাজডুবি আর নিখোঁজ হওয়ার সংখ্যা অনেক। কিন্তু এর পর থেকে ব্যাপার দাঁড়াল এই, সমস্ত জাহাজ দুর্ঘটনার জন্যেই দায়ী করা হতে লাগল এই অতিকায় দানবটাকে। তিন হাজারের বেশি জাহাজ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ বের করতে পারল না জাহাজ কোম্পানির লোকেরা। সমস্ত দোষই গিয়ে পড়ল কল্পিত প্রাণীটার ঘাড়ে। এভাবে একের পর এক জাহাজগুলো নিরুদ্দেশ হতে শুরু করায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে উঠল। দূর সাগরে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। নিজ নিজ সরকারের কাছে দাবি জানাল জনসাধারণ—অবিলম্বে এই অজানা আতঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করা হোক সমুদ্রকে।

দুই

প্যারিস মিউজিয়ামের জীববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে তখন যথেষ্ট সুনাম আমার। আমেরিকার দুর্গম নেব্রাস্কা অঞ্চল সফর করে নিউ ইয়র্কে ফিরেছি। এই অদ্ভুত ঘটনাটা আর সবার মত আমাকেও চঞ্চল করে তুলল। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে বেরুনো খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়তে লাগলাম। প্রথমে তেমন বিশ্বাস না হলেও স্কোশিয়ার দুর্ঘটনার পর প্রাণীটার অস্তিত্ব সম্পর্কে আর সন্দেহ করার কোন উপায়

থাকল না।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ নিয়ে জোর বিতর্ক শুরু হলো। কারও মতে এটা ডুবোজাহাজ, কারও মতে অসাধারণ ক্ষমতাশালী একটা প্রাণী। এ ধরনের শক্তিশালী বিশাল একটা ডুবোজাহাজ সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কারও পক্ষে বানানো অসম্ভব। কোন দেশের সরকার কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানীর সাহায্যে কি করেছেন কাজটা? কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গেল সব দেশেরই ক্ষতি করে চলেছে এটা। তাই ডুবোজাহাজের চিন্তা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না।

ফ্রান্সে থাকতেই 'ডুবোজাহাজের রহস্য' নামে একটা বই লিখেছিলাম। যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল বইটা। হয়তো বা সে কারণেই 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড' পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে—অর্থাৎ প্যারিস মিউজিয়ামের অধ্যাপক মঁশিয়ে পিয়ের অ্যারোনাক্সকে এ ব্যাপারে একটা প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করা হলো। লিখলাম। প্রবন্ধটার বিশেষ বিশেষ অংশ তুলে দিচ্ছি:

'পানির বারো থেকে পনেরো মাইল নিচে, গভীর সাগর তলে আমাদের অজানা অসংখ্য প্রাণীর বাস। এটাও তেমনি একটা প্রাণী। মাঝে মাঝে কোন রহস্যময় কারণে অথবা নিছক খেয়ালের বসে উঠে আসে পানির উপরের স্তরে।

'বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করে এটাকে তিমি বললে ভুল হবে না। খড়্গের মত দাঁতওয়ালা এক ধরনের তিমি আছে। এগুলো নারহোয়েল বলে পরিচিত। ষাট ফুটের বেশি লম্বা হয় না এরা।

'নারহোয়েলের খড়্গটি ইস্পাতের মত কঠিন। মাঝে মাঝে জাহাজের তলায় খড়্গ বিঁধিয়ে দেয় নারহোয়েলরা। পরে জাহাজের তলা থেকে সে খড়্গ টেনে বার করা হয়। প্যারিস মিউজিয়ামের চিকিৎসা বিভাগে সোয়া দু'গজ লম্বা এ ধরনের একটা খড়্গ আছে। সেটার গোড়ার দিকের পরিধি পনেরো ইঞ্চিরও বেশি।

'ধরে নিচ্ছি সাধারণ নারহোয়েলের চেয়ে দশগুণ বড় একটি প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে সাগরের বুকে। এখন সেই প্রাণীটা যদি ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে ছুটে এসে ওর বিশাল খড়্গ দিয়ে মেরে স্কোশিয়ার মত জাহাজের তলায় ছেঁদা করে দেয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই।

'এসব দিক বিবেচনা করলে সহজেই বোঝা যায় বিশাল ভয়ঙ্কর একটা নারহোয়েল ছাড়া প্রাণীটা আর কিছুই নয়।'

প্রায় সবাই এক বাক্যে আমার যুক্তিগুলো মেনে নেয়ায় অতিকায় নারহোয়েল-টাকে ধরার জন্যে তোড়জোর শুরু হয়ে গেল। 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' নামে নিউ ইয়র্কের একটা বিশাল ডেস্ট্রয়ারকে এ কাজে পাঠানো হবে বলে স্থির করা হলো। পানি থেকে প্রাণীটিকে ডাঙায় তোলার সবরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি নেয়া হলো জাহাজে। এবার অপেক্ষার পালা। প্রাণীটাকে এখন কোথাও দেখা গেলেই সেদিকে রওনা দেবে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। অধীর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল জুন মাসের দু'তারিখে। সানফ্রানসিসকো কোম্পানির একটা স্টীমার সাংহাই ও ক্যালিফোর্নিয়ার মাঝামাঝি উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে দেখল ওটাকে।

'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' ব্রুকলীন ছেড়ে যাবার মাত্র ঘণ্টা তিনেক আগে একটা চিঠি পেলাম আমি:

মঁশিয়ে অ্যারোনাক্স,

আপনি ফ্রান্স সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনে'র এ

অভিযানে যোগ দিলে ইউনাইটেড স্টেটস অত্যন্ত আনন্দিত হবে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আপনার জন্যে একটা কেবিন সংরক্ষিত রেখেছেন।

আপনার বিশ্বস্ত
জে. বি. হবসন
সেক্রেটারি, নৌবিভাগ।

তিন

চিঠিটা পড়েই ঠিক করে ফেললাম যাব। ওই সামুদ্রিক মায়ামৃগের পিছু নেবার মত এমন সুযোগ আর পাব না। বহুদিনের পুরানো, অনুগত ভৃত্য কনসীলকে ডাকলাম। ওর বাড়ি ফ্ল্যাণ্ডার্সে। গত দশ বছরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে যেখানেই গেছি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমার সঙ্গী হয়েছে কনসীল। দৃঢ় স্বাস্থ্যের অধিকারী, কনসীলের নীতিবোধ রয়েছে, কিন্তু স্নায়বিক দুর্বলতা নেই। আমার বয়েস তখন চল্লিশ, আমারচে দশ বছরের ছোট সে। মাত্র একটি দোষ ওর। পোশাকি ভদ্রতা ওর এত বেশি ছিল যে, মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেতাম আমি।

'কনসীল!' আবার ডাকলাম আমি।

'আমাকে ডেকেছেন, স্যার?' দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল কনসীল।

'হ্যাঁ, শোনো, জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নাও। দু'ঘণ্টার ভেতরই রওনা হচ্ছি আমরা।'

'প্যারিসে ফিরছি, স্যার?'

'হ্যাঁ, তবে একটু ঘুরপথে। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনে চড়ে।' একটু থেমে ওকে বুঝিয়ে বললাম, 'প্রথমে যাব সেই প্রকাণ্ড নারহোয়েলটার খোঁজে। প্রাণীটার পেছনে পেছনে কতদূর যেতে হবে বলা মুশকিল। অত্যন্ত খেয়ালী হয় এরা।'

'আপনার মর্জি।' কনসীল আগের মতই নির্বিকার।

চটপট একটা ভাড়াটে গাড়ি ঠিক করে আমাদের মালপত্র সহ জাহাজে পৌঁছে গেলাম। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের খোঁজ করতেই একজন নাবিক আমাকে ওঁর কেবিন দেখিয়ে দিল। সুন্দর চেহারা ক্যাপ্টেনের। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি, 'মঁশিয়ে পিয়ের অ্যারোনাক্স?'

'জ্বী, আপনি কমাণ্ডার ফ্যারাগুট?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আপনাকে পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছি, প্রফেসর। চলুন আপনার কেবিন দেখিয়ে দিই।'

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে পছন্দ হলো আমার। দানবটাকে ধরার উপযুক্ত জাহাজই বটে। আঠারো নটের বেশি গতিতে ছুটতে পারে 'অ্যাব্রাহম লিঙ্কন' যদিও দানবটার গতির তুলনায় এ কিছুই নয়।

কামান ঘরের পাশেই আমার চমৎকার কেবিনটা। কনসীলকে জিনিসপত্র গুছাতে বলে জাহাজের পেছনে গিয়ে যাত্রার তোড়জোর দেখতে লাগলাম। কমাণ্ডার ফ্যারাগুট জাহাজে নোঙর তোলার আদেশ দিচ্ছেন। আর মাত্র পনেরো মিনিট পরে এলে এক রোমাঞ্চকর, দুর্লভ অভিযানে যোগ দেয়ার সুযোগ হারাতাম আমি।

ব্রুকলীন বন্দর আর ইস্ট রিভারের তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চল তখন লোকে লোকারণ্য। জাহাজ হাডসন নদীতে পড়া পর্যন্ত হাজার হাজার লোকের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল। রুমাল নেড়ে জাহাজের যাত্রীদের অভিনন্দন জানাল তারা। নিউ জার্সির ডান দিক ঘেঁষে কেল্লাগুলোর মাঝখান দিয়ে যাওয়ার সময় কেল্লা থেকে তোপধ্বনি করে শুভেচ্ছা জানানো হলো জাহাজকে। প্রত্যুত্তরে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' থেকে তিনবার আমেরিকার জাতীয় পতাকা তুলে ধরা হলো। ঝিকমিক করে উঠল পতাকার উনচল্লিশ নক্ষত্র। ধীরে ধীরে সঙ্কীর্ণ প্রণালী পেরিয়ে সাগরে পড়ল জাহাজ। জাহাজের শেষ ঘণ্টা বাজল। ইঞ্জিনের চাপা গুম গুম শব্দ ক্রমশ গম্ভীর হলো, বেড়ে গেল জাহাজের গতি। আটটার একটু পরে ফায়ার আইল্যাণ্ডকে পেছনে ফেলে আটলান্টিকের ঘন সবুজ জলরাশি ভেদ করে পূর্ণগতিতে এগিয়ে চলল 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'।

চার

সুদক্ষ নাবিক ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট। মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন কোন অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীই সাগরে এই সমস্ত উপদ্রব ঘটিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রতিজ্ঞা করেছেন এই সামুদ্রিক বিভীষিকাকে ধরবেনই। এতে হয় তাঁর প্রাণ যাবে নয় জন্তুটার। 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের' আর সব অফিসারদেরও এই একই প্রতিজ্ঞা।

প্রাণীটাকে দেখার জন্য সবাই উতলা হয়ে উঠেছেন। সারাক্ষণই কেউ না কেউ দূরবীন নিয়ে দূর সাগরের দিকে চেয়ে বসে থাকে। দিনের বেলা সূর্যের প্রচণ্ড তাপে আগুন হয়ে ওঠে জাহাজের ডেক। সেই উত্তপ্ত ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পালা করে সাগরবক্ষে জানোয়ারটাকে খোঁজে নাবিকেরা।

প্রাণীটাকে খোঁজার ব্যাপারে আরও একটা বড় আকর্ষণ রয়েছে। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট ঘোষণা করেছেন, যে প্রাণীটাকে প্রথম দেখতে পাবে তাকে দু'শো ডলার পুরস্কার দেয়া হবে।

সবার মত আমিও রোজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সাগরের দিকে চেয়ে বসে থাকি সারা জাহাজে মাত্র একজন লোকের এ ব্যাপারে কোন রকমের উৎসাহ ছিল না—সে হলো কনসীল।

অস্ত্রশস্ত্রের দিক থেকে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের' কোন ত্রুটি ছিল না। হাতে ছোঁড়ার হারপুন থেকে শুরু করে বিশাল কামান পর্যন্ত সবই রয়েছে জাহাজে। তবে জাহাজের সবচে বড় সম্পদ হচ্ছে একজন লোক—নেডল্যাণ্ড।

নেডল্যাণ্ডের বাড়ি ক্যানাডায়। হারপুন ছোঁড়ায় জুড়ি নেই ওর। বুদ্ধিমান, ধীর স্থির অথচ বেপরোয়া নেডল্যাণ্ডের হারপুনের হাত থেকে কোন তিমি প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে বলে শোনা যায়নি। লম্বায় ছ'ফুট, সুগঠিত স্বাস্থ্যের অধিকারী

নেডের বয়স চল্লিশ। স্বল্পভাষী এই লোকটা কোন কারণ ছাড়াই মাঝে মাঝে বেজায় খেপে যেত। এজন্য সবাই তাকে বুঝে-সমঝে চলত।

ক্যানাডা আর ফ্রান্সের লোকদের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকে। তাই অল্প সময়েই নেডের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল আমার। মেরু অঞ্চল সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রোমাঞ্চকর কাহিনী আর মাছ শিকারের গল্প শোনাত সে আমাকে। নেডের বর্ণিত সে কাহিনীতে আমি কাব্যের সৌন্দর্য খুঁজে পেতাম।

নেড কিন্তু জাহাজের লোকেদের মত প্রাণীটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না। একদিন আমি আর নেড জাহাজের পিছন দিকের ডেকে বসে আছি। আমাদের রওনা দেবার পর তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেছে। আর আট দিন পরই জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করবে। নানা আলোচনার পর হঠাৎ নেডকে প্রশ্ন করলাম আমি, 'আচ্ছা, নেড, এই প্রাণীটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো না কেন তুমি? তোমার পেশাই হচ্ছে তিমি মারা। সবরকম স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণীই তুমি চেন। বিশাল সব জীবের বাস মহাসাগরগুলোতে। একটা প্রকাণ্ড সামুদ্রিক জীবের কল্পনা করা কি খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু?'

'না, প্রফেসর,' নেড বলল, 'অন্ধ লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা সোজা, কোন উদ্ভট ধূমকেতু বা পৃথিবীর অভ্যন্তরের দৈত্য দানোর অস্তিত্বের কথা সহজেই বিশ্বাস করতে পারে তারা, কিন্তু কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানী বা ভূতাত্ত্বিকের পক্ষে এ ধরনের আজগুবি গল্প বিশ্বাস করা মোটেই সহজ নয়। বহু সামুদ্রিক প্রাণীকে তাড়া করে ফিরেছি আমি সারা জীবন, দেখেছিও অনেক। আমার ধারণা, তাদের দেহে যতই অস্ত্র থাকুক তা দিয়ে জাহাজের তলার লোহার পাতে ছেঁদা করা তো দূরের কথা আঁচড় কাটাও সম্ভব নয়।'

'কিন্তু, নেড, নারহোয়েলরা জাহাজের তলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে এমনও তো শানা যায়।'

'জাহাজের তলা কাঠের হলে তা সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু স্বচক্ষে না দেখলে এ কথাটাও বিশ্বাস করব না আমি।'

'কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখ, অতিকায় কোন নারহোয়েল যদি থেকেই থাকে, সে বসবাস করে সাগরের কয়েক মাইল নিচে, তাহলে তার শারীরিক গঠন এমন হবে যে প্রাণীটি হবে অমিত শক্তির অধিকারী।'

'তা কেন হবে?' নেডের প্রশ্নে তাচ্ছিল্য।

'কারণ সাগরের কয়েক মাইল নিচে পানির চাপ এত প্রবল যে অসাধারণ শক্তিশালী প্রাণী ছাড়া ওখানে কেউ টিকতে পারবে না। পানির চাপ কি রকম তা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। পানির বত্রিশ ফুট নিচে প্রাণীদের শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় পনেরো পাউণ্ড করে চাপ পড়ে। এভাবে হিসেব করলে সমুদ্রের ছ'মাইল গভীরতায় শরীরের প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে চাপ পড়বে ৫৬০০ পাউণ্ড।'

'ওরেব্বাপ! তাই নাকি?' চেঁচিয়ে উঠল নেড।

'বেশ, এবার কল্পনা করো তো, কয়েকশো গজ লম্বা আর সেই অনুপাতে চওড়া একটা প্রাণী যদি পানির অত গভীরে বাস করে তাহলে সে কতটা চাপ সহ্য করে? তার লক্ষ লক্ষ ইঞ্চিব্যাপী শরীরের উপর সে কয়েক কোটি পাউণ্ড চাপ সহ্য করে। যে প্রাণী এতটা চাপ অনায়াসে সহ্য করে নিতে পারে তার শারীরিক গঠন নিশ্চয়ই হবে ইস্পাতের মত কঠিন আর সেই অনুপাতে শক্তিও থাকবে তার।'

'তাহলে তো প্রাণীটার শরীর আট ইঞ্চি মোটা লোহার পাত দিয়ে মোড়া থাকা দরকার।' গভীর বিস্ময় নেডের কণ্ঠে।

'সে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো। এখন এই দৈত্যাকৃতি প্রাণীটা যদি এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে এসে একটা জাহাজের গায়ে আঘাত করে তাহলে জাহাজটার কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?'

'তাই তো···।' চিন্তান্বিত ভাবে বলল নেড।

'তাহলে আমার কথা মেনে নিচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনার একটা কথা মানছি,' নেড বলল, 'সাগরের ওই অত গভীরে যদি কোন প্রাণী থেকে থাকে তাহলে তার শক্তি ঠিক এরকমই হবে।'

'পথে এসেছ তাহলে, হারপুন-বীর, যদি সেরকম কিছু নাই থাকে তাহলে স্কোশিয়ার দুর্ঘটনাটা ঘটল কি করে?'

পাঁচ

জুলাই মাসের সাত তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ল 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'।

'এবার সাগরের উপর আরও কড়া নজর রাখতে হবে,' বলাবলি শুরু করল নাবিকরা। বলা বাহুল্য, যাত্রার শুরু থেকেই কড়া নজর রাখতে কেউ কসুর করছিল না—দুশো ডলার কম নয়।

টাকার প্রতি আকর্ষণ আমার ছিল না। তবু খাওয়া আর ঘুমানোর সময়টুকু বাদে বাকি সময়টা রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে জাহাজের ডেকে বসে থাকতাম। লক্ষ্য সাগরের উপর। পানির উপর কোন তিমি জাতীয় প্রাণীকে ভেসে উঠতে দেখলেই উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যেত সারা জাহাজে। গতি বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' জানোয়ারটার দিকে ধেয়ে যেত। কিন্তু লাভ হত না। কাছে গেলেই পরিষ্কার হয়ে যেত সেটা একটা সাধারণ তিমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ক'দিন পর জাহাজ একটু পশ্চিমে বাঁক নিল। গভীর পানিতে থাকাই ভাল মনে করলেন ক্যাপ্টেন। জাহাজ এ সময় মার্কুইস ও স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের কাছে। এখানেই শেষ দেখা গিয়েছিল প্রাণীটাকে। জাহাজের প্রত্যেকটি লোক অসহ্য উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। দিনের মধ্যে অন্তত বিশবার কেউ না কেউ কিছু একটা দেখেই চেঁচিয়ে উঠছে, আর সবাই ছুটছে তাই দেখতে।

দেখতে দেখতে তিন মাস কেটে গেল। জাপান ও আমেরিকার সমস্ত উপকূল চষে বেড়িয়েছে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। ক্রমে জাহাজের যাত্রী ও নাবিকেরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট ছাড়া জাহাজের প্রত্যেকটা লোক হতাশ হয়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত একদিন জাহাজের নাবিকেরা ক্যাপ্টেনকে চেপে ধরল ফিরে যাবার জন্যে। অনেক কথা কাটাকাটির পর তাদের কাছে তিন দিনের সময় চাইলেন ক্যাপ্টেন। এ তিন দিনে দানবটার দেখা না মিললে দেশে ফিরে যাবে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'।

সেদিন নভেম্বরের দু'তারিখ। লক্ষ রাখা হচ্ছে সাগরের উপর। তিন দিনের দু'দিন পেরিয়ে গেল। জন্তুটাকে সাগরের গভীর থেকে উপরে টেনে আনার নানারকম ফন্দি ফিকির করা হলো। শুয়োরের গোশতের বড় বড় টুকরো পানিতে ছাড়া হলো—কিন্তু সব গেল হাঙ্গরের পেটে। জাহাজের চার পাশের পানিতে আঁকশি দিয়ে খুঁজে দেখা হলো। কিন্তু এত আয়োজন সব ব্যর্থ করে কেটে গেল চৌঠা নভেম্বরের রাতও।

পরের দিন, পাঁচই নভেম্বর রাত বারোটায় ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের চেয়ে নেয়া সময়ের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। জাহাজ তখন ৩১°১৫´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ১৩৬°৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমার ভেতরে। জাপানের উপকূল দুশো মাইল দূরে।

সমুদ্র শান্ত সেদিন। বড় বড় মেঘ ঘিরে এসেছে চাঁদের চারপাশে। জাহাজের গতি মন্থর। ঢং ঢং করে সন্ধ্যা আটটা বাজার ঘণ্টা পড়ল।

ডেকের রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছি আমি। পাশেই দাঁড়িয়ে কনসীল, সামনে দৃষ্টি প্রসারিত তার। আবছা অন্ধকারে ঢাকা দিগন্তরেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নাবিকেরা। চোখে দূরবীন লাগিয়ে সমুদ্রের বুক তন্ন তন্ন করে খুঁজছে অফিসাররা। হঠাৎ মেঘ কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল চাঁদ। আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাগর বক্ষ।

কনসীলের দিকে তাকালাম। একটু যেন ভাবান্তর হয়েছে ওর। ওর মত অবিশ্বাসীও যেন জীবটাকে দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে।

'কনসীল,' ডাকলাম আমি, 'দুশো ডলার পাবার শেষ সুযোগ এখন আমাদের হাতে।'

'যদি অনুমতি দেন তো বলি,' বলল কনসীল, 'টাকার উপর লোভ নেই আমার। একশো হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করলেও আমার কিছু এসে যেত না।'

'ঠিকই বলেছ, কনসীল। সমস্ত ব্যাপারটাই এখন ছেলেমানুষি ঠেকছে। ভাবতে ভাল লাগছে, ছ'মাসের মধ্যেই ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি আমরা। দেশে ফিরলে কিন্তু এই পাগলামির জন্যে লোকেরা দারুণ খেপাবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, আপনাকে নিয়ে তো ঠাট্টা করবেই, আমার···।'

কথা শেষ হলো না কনসীলের। চারপাশের সমস্ত নীরবতা আর প্রশান্তিকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নেডল্যাণ্ড, 'ওই যে, ওই-ই! যার খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা এতদিন!'

ছয়

মুহূর্তে ছুটে এল জাহাজের লোকজন। নেডকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। জাহাজের ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। গাঢ় মেঘে আবার ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নেডল্যাণ্ডের নির্দেশিত দিকে চেয়ে দেখলাম, জাহাজ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে সমুদ্রের খানিকটা অংশ এক ধরনের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে। ফসফরাসের আলো ওটা নয়। কয়েক মুহূর্ত পরই

পানিতে তলিয়ে গেল আলোর উৎস। সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকেরা এ আলোর কথাই বলেছে বারবার।

একজন অফিসার মন্তব্য করলেন, 'সমুদ্র জলের ফসফরাস দানা বেঁধে সৃষ্টি হয়েছে আলোর।'

প্রতিবাদ করলাম আমি, 'অসম্ভব। ফসফরাসের আলো এত উজ্জ্বল হতে পারে না। এ বৈদ্যুতিক আলো। ওই যে দেখুন আবার ভেসে উঠছে ওটা। নড়ছে। আরে—আরে আমাদের দিকেই তো আসছে ওটা!'

ব্যাপার দেখে শোরগোল করে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।

'চুপ।' ক্যাপ্টেনের কঠোর কণ্ঠ শোনা গেল। ইঞ্জিনিয়ারকে জাহাজের মোড় ফেরাতে আদেশ দিলেন তিনি।

মোড় ঘুরে ছুটল জাহাজ। দ্বিগুণ বেগে জাহাজের দিকে ছুটে আসছে প্রাণীটা। জাহাজের প্রত্যেকটা লোক রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে ওটার দিকে।

জাহাজকে ঘিরে ঘুরতে লাগল সেটা। তারপর সাঁ করে সরে গেল মাইল তিনেক দূরে। পানির একটু নিচে ডুবে গেল আলোটা। তারপর নাক বরাবর সোজা ছুটে এল জাহাজের দিকে। জাহাজের গায়ে ধাক্কা না মেরে তলা দিয়ে ওপাশে চলে গেল।

একটু বিচলিত মনে হলো ক্যাপ্টেনকে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রফেসর, কি ধরনের জীব এটা? এই অন্ধকারে না জেনে কোনরকম ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না। চুপচাপ সকালের অপেক্ষা করাই বোধহয় ভাল।'

গতি কমিয়ে দেয়া হলো জাহাজের। পানির উপর মন্থর গতিতে ভাসছে নারহোয়েল। কিন্তু পিঠের আলোটা দেখা যাচ্ছে না আর। একটা বাজতে সাত মিনিট বাকি। হঠাৎ হুইস্‌লের মত একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ আওয়াজে খান খান হয়ে গেল নীরবতা।

আমি, ক্যাপ্টেন আর নেড তখন ডেকে দাঁড়িয়ে। নেডকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'নেড, তিমির গর্জন শুনেছ কখনও?'

'বহুবার,' জবাব দিল নেড, 'কিন্তু ওই অদ্ভুত আওয়াজ শুনিনি জীবনে। ব্যাটাকে হারপুনের নাগালে পেলে…'

'কিন্তু ওর কাছে যেতে হলে তো ছোট নৌকার দরকার। আর ওভাবে ওটাকে মারতে যাওয়ার অর্থ জাহাজের সবাইকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া। এতবড় ঝুঁকি নেয়া যাবে না।'

রাত দুটোয় আবার দেখা গেল উজ্জ্বল আলো। পানি তোলপাড় করে নড়ে বেড়াচ্ছে ওটা।

দিনের আলো ফুটতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হলো। মাছ ধরার বিশাল জালগুলো নামানো হলো। হারপুন গান আর লম্বা নলওয়ালা গাদা বন্দুকগুলো সারি দিয়ে রাখা হলো ডেকে। নেডল্যাণ্ড তার লম্বা ফলাওয়ালা হারপুনের মাথাটা ঘষে ঘষে চোখা করতে শুরু করেছে।

কিন্তু এত আয়োজন সব বিফলে যাবার জোগাড়। সকাল সাতটায় ঘন কুয়াশা নামল সাগরের বুকে। কয়েক গজ দূরের জিনিসও পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে না। আটটা নাগাদ আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে গিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল দিগন্তরেখা। আগের দিনের মতই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নেড, 'ওই যে, ওই যে

হতচ্ছাড়া জানোয়ারটা!'

সেদিকে তাকাল সবাই। প্রায় দেড় মাইল দূরে ভাসছে প্রাণীটা। গায়ের রঙ ঘন কালো। লেজের কাছে পানিতে সৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড ঘূর্ণী। কোন জলজন্তুর লেজের ঝাপটায় পানিতে এমন প্রবল আলোড়ন হতে দেখিনি বা শুনিনি কখনও।

ধীরে ধীরে ওটার দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। ভালমত দেখে বুঝলাম প্রাণীটার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে 'হেলভেশিয়া' ও 'শ্যানন' জাহাজের রিপোর্টে একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে। দৈর্ঘ্যে ওটা আড়াইশো ফুটের বেশি হবে না।

হঠাৎ জানোয়ারটার শরীরের দুটো ছিদ্র দিয়ে পানি আর বাষ্প বেরোতে শুরু করল। প্রায় দুশো ফুট উপরে উঠে যাচ্ছে পানি। এভাবেই বোধহয় শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় প্রাণীটা। আমার ধারণা হলো স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর মেরুদণ্ডী প্রাণী ওটা।

জাহাজের সবাই খুঁটিয়ে দেখছে প্রাণীটাকে। ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'বয়লারে যথেষ্ট বাষ্প আছে না?'

'আছে।' উত্তর দিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

'গুড। পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে দিন।'

উত্তেজনার শিহরণ বয়ে গেল জাহাজ জুড়ে। লড়াই শুরু হবে এবার। জানোয়ারটার দিকে ধেয়ে চলল জাহাজ। প্রথমে স্থির দাঁড়িয়ে ছিল প্রাণীটা, কিন্তু জাহাজ কাছাকাছি পৌঁছতেই একটু সরে গেল।

প্রায় পৌনে একঘণ্টা ধরে প্রাণীটাকে বাগে আনার চেষ্টা করল 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। কিন্তু কিছুতেই ওটার দুশো গজের মধ্যে পৌঁছতে পারল না। নেডল্যাণ্ডকে ডেকে পাঠালেন ক্যাপ্টেন। নৌকা নামিয়ে প্রাণীটার কাছে যাওয়া যায় কিনা জানতে চাইলেন।

'অসম্ভব।' উত্তর দিল নেড, 'ওই হারামী জানোয়ারটাকে বশে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। অতটা ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

'কি করা যায় তাহলে?'

'গতি বাড়িয়ে দিন জাহাজের। দেখি কোনমতে ওকে আমার হারপুনের নাগালে পাওয়া যায় কিনা।'

খুশি হলেন ক্যাপ্টেন। তক্ষুণি ডাকলেন ইঞ্জিনিয়ারকে। জাহাজের গতি বাড়াতে বললেন।

জায়গা বেছে দাঁড়াল নেডল্যাণ্ড। সাড়ে আঠারো মাইল বেগে ছুটছে এখন জাহাজ। কিন্তু সমান দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে প্রাণীটা।

খেপে গেলেন ক্যাপ্টেন। আরও গতি বাড়ানোর আদেশ দিলেন। থর থর করে কাঁপতে লাগল গোটা জাহাজ। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আকাশ। যে-কোন মুহূর্তে এখন বয়লার ফেটে যাওয়ার ভয় আছে। প্রায় বিশ মাইল বেগে ছুটছে জাহাজ। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হলো না। দৌড়ের পাল্লা লাগিয়েছে যেন জানোয়ারটা জাহাজের সাথে।

'দৌড়ের পাল্লায় হারানো যাবে না ওকে।' কথাটা বলেই কামান দাগার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

কামান দাগা হলো। প্রাণীটার কয়েক ফুট উপর দিয়ে বেরিয়ে গেল গোলা।

'ডান দিক ঘেঁষে মার। প্রথম যে লাগাতে পারবে পাঁচশো ডলার পুরস্কার।'

এক বৃদ্ধ গোলন্দাজ গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরে নিশানা করে কামান দাগল।

কিন্তু আশ্চর্য! গোলাটা জন্তুটার পিঠে লেগে টেনিস বলের মত ড্রপ খেয়ে আরও এক মাইল দূরে গিয়ে সাগরের পানিতে ছিটকে পড়ল। কিছুমাত্র ক্ষতি হলো না প্রাণীটার।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। কোনমতেই কাবু করা গেল না প্রাণীটাকে। এক সময় সাঁঝ হলো। সাঁঝের পর রাত। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না আর ওটাকে। ঠিক এমনি সময় প্রাণীটা যেখানে থাকার কথা সেখানে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো। জ্বলেই নিভে গেল। রাত এগারোটায় আবার জ্বলে উঠল আলো। নিভল না আর। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখন প্রাণীটা। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে, এই-ই সুযোগ।

অতি সন্তর্পণে জানোয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। দু'পায়ের উপর খাড়া হয়ে হারপুন ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে নেডল্যাণ্ড।

ক্রমেই প্রাণীটা আর জাহাজের দূরত্ব কমছে। বিশ ফুটের মাঝে এসে যেতেই হারপুন ছুঁড়ল নেডল্যাণ্ড। লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করল হারপুন। আওয়াজ শুনে মনে হলো ইস্পাতের গায়ে ঠং করে বাড়ি খেয়েছে হারপুনের মাথা। নিভে গেল উজ্জ্বল আলো। সাথে সাথে বিশাল দুটো জলস্তম্ভ ভেঙে পড়ল জাহাজের উপর। পানির প্রচণ্ড ঝাপটায় ছিটকে পড়ল লোকজন, ছিঁড়ে গেল মাস্তুলের দড়িদড়া। হঠাৎ কিসের যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল জাহাজের গায়ে। তাল সামলাতে না পেরে রেলিং টপকে আমি ছিটকে পড়লাম সাগরে।

সাত

প্রানিতে পড়েই নেমে চললাম নিচের দিকে। প্রায় বিশ ফুটের মত তলিয়ে গিয়ে আবার ভেসে উঠলাম। সাঁতার ভালই জানা ছিল। ভেসে উঠে দেখলাম বেশ দূরে একটা কালো ছায়া ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে। বুঝলাম ওটাই আমাদের জাহাজ 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'।

পাগলের মত জাহাজের দিকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'বাঁচাও—বাঁচাও।'

সমস্ত জামাকাপড় ভিজে শরীরের সাথে লেপটে গেছে। ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে এল শরীর। শেষবারের মত চেঁচিয়ে উঠে ডুবতে শুরু করলাম।

ঠিক এমনি সময় পিঠের কাছে জামাটা টেনে ধরল কেউ, কানের কাছে শোনা গেল কনসীলের গলা, 'আমার কাঁধে ভর দিন, স্যার, তাহলে সহজেই সাঁতরাতে পারবেন।'

এক হাতে কনসীলের গলা জড়িয়ে ধরলাম।

'তুমিও কি আমার মত পানিতে পড়ে গিয়েছিলে, কনসীল?'

'না। আপনাকে পড়ে যেতে দেখে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছি।'

'আর আমাদের জাহাজ?'

'জাহাজের কথা আর বলবেন না। এতক্ষণে হয়তো 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'কে গুঁড়ো করে ফেলেছে দানবটা।'

একেবারে হতাশ হয়ে গেলাম। এই নিঃসীম সাগরে হারিয়ে গেছি আমরা।

কিন্তু কনসীল সাহস দিল আমাকে। ভেজা পোশাকগুলো খুলে নিল আমার শরীর থেকে। বাঁচার কোন আশা নেই। সূর্য উঠতে বহু দেরি এখনও।

আরও পরে ব্যথায় আমার হাত পা অবশ হয়ে এল। কনসীলকে বললাম, আমাকে ছেড়ে দাও, কনসীল। নিজে বাঁচার চেষ্টা করো।'

'এই অবস্থায় মনিবকে ছেড়ে দেব? তা কি কখনও হয়?'

ঠিক এই সময় চাঁদ উঠল। নিষ্প্রাণ ঠোঁট দুটো থেকে কোন আওয়াজ বের করতে পারলাম না। মাঝে মাঝে শুধু কনসীল ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে, 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

হঠাৎ মনে হলো কে যেন কনসীলের ডাকে সাড়া দিচ্ছে। কনসীলকে বললাম, 'শুনছ, কনসীল?'

'হ্যাঁ।'

মরিয়া হয়ে আর একবার ডাক দিল কনসীল।

আবারও ভেসে এল উত্তর। তবে কি ও আমাদের মতই কোন হতভাগা, না 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' থেকে আমাদের খোঁজে বোট পাঠানো হয়েছে?

কোনরকমে মাথা খাড়া করে তাকাল কনসীল। কি যেন দেখে চমকে উঠল। মাথাটা আবার এলিয়ে দিল পানিতে।

'কি দেখলে, কনসীল?' জানতে চাইলাম আমি।

'কি দেখলাম? দেখলাম···দেখলাম···'

চকিতে দানবটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম ওটার কথা। পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে গেল শরীর। কোনরকমে একবার মাথাটা তুলেই তলিয়ে যেতে শুরু করলাম পানিতে।

হঠাৎ পায়ে একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শ লাগল। তারপরই টের পেলাম কেউ আমাকে টেনে তুলে শক্ত কিছুর উপর শুইয়ে দিচ্ছে। পরমুহূর্তে জ্ঞান হারালাম আমি। বহুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম।

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম অস্তগামী সূর্যের শীর্ণ রশ্মিতে আমার চোখের সামনে ঝলমল করছে একটি মুখ। কনসীল নয়, কিন্তু সে মুখ আমার চেনা।

'নেড, তুমি!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'হ্যাঁ।' উত্তর দিল নেড।

'তুমিও কি আমাদের মতই পানিতে পড়ে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার কপালটা একটু ভাল। পড়েই টের পেলাম একটা ভাসমান দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে আছি।'

'দ্বীপ?'

'দ্বীপ ঠিক না, সেই অতিকায় নারহোয়েলটা।'

নেডের কথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মাথায়। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। যেটার উপর বসে আছি সম্পূর্ণ পিঠটা তার পানির উপর ভেসে আছে। পা দিয়ে চাপ দিয়ে টের পেলাম সামুদ্রিক জীবের শরীর এমন দুর্ভেদ্য ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয় না। কিন্তু হয় না বললেই যে হবে না এমন কোন কথা নেই। হয়তো কচ্ছপ বা কুমীর জাতীয় প্রাণী এটা। বোটের মত গড়ন।

হঠাৎ পেছনের পানিতে তুমুল আলোড়ন তুলে চলতে শুরু করল প্রাণীটা।

'যতক্ষণ এটা পানিতে ভেসে থাকবে ততক্ষণ ভয় নেই। কিন্তু একবার ডুব

দিলেই গেছি।' বিড় বিড় করে বলল নেড।

একটু পরই রাতের আঁধার ঘনিয়ে এল। রাত যত গভীর হলো ততই দুর্ভাবনা বাড়তে লাগল। প্রাণীটার শরীরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য সব শব্দ ভেসে আসছে। সারাটা রাত ঘুরলাম ওটার পিঠে চড়ে।

আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটল। কুয়াশা কেটে পরিষ্কার হওয়ার পর ভালমত দেখলাম ওটাকে। হঠাৎ আমাদের পিলে চমকে দিয়ে ডুবতে শুরু করল প্রাণীটা।

'থাম, হতভাগা, নচ্ছাড়!' পা দিয়ে সজোরে ওটার পিঠে লাথি মেরে চেঁচিয়ে উঠল নেডল্যাণ্ড। 'থাম, হতভাগা থাম!'

ডোবা বন্ধ হয়ে গেল প্রাণীটার। একটু পরই প্রায় সমতল পিঠের এক জায়গায় একটা ঢাকনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল একটা লোক। আমাদের দেখতে পেয়েই অস্ফুট চিৎকার করে সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে চলে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, প্রাণীট্রাণী কিচ্ছু না, এটা একটা ডুবোজাহাজ।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখোশ পরা আটজন বলিষ্ঠ লোক নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে বন্দী করে ডুবোজাহাজের ভেতরে নিয়ে গেল।

আট

নির্ঘাত জলদস্যুদের হাতে পড়েছি। ভাবলাম আমি। সরু একটা অন্ধকার গলি দিয়ে চললাম। প্রথমে আমি, পেছনে কনসীল আর নেড। ছোট একটা দরজা খুলে আমাদেরকে সে পথে ঢুকিয়ে দিয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিল লোকগুলো। দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাগে চেঁচাতে লাগল নেড। কোনরকমে বুঝিয়ে শুনিয়ে ওকে শান্ত করলাম।

আধ ঘন্টা কেটে গেল। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর একঝলক আলো ঠিকরে এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। ঘরের ছাদে আটকানো আধখানা চাঁদের মত জ্বলছে আলোটা। উজ্জ্বল আলোয় ঘরের ভেতরটা দেখলাম। ঠিক মাঝখানে একটা টেবিলের চারপাশে গোটা পাঁচেক টুল।

বাইরে দরজার হাতল খোলার শব্দ হলো। ঘরে ঢুকল দু'জন লোক। দু'জনের মাথায়ই সামুদ্রিক উদ্ভিদের তৈরি একরকম টুপি। দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটি দুর্বোধ্য ভাষায় আমাদের উদ্দেশ্যে কি যেন বলল। তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল আমার দিকে।

বিশুদ্ধ ফরাসী ভাষায় ওদেরকে আমাদের নাম-ধাম-পরিচয় জানালাম। মন দিয়ে ওরা শুনল ঠিকই কিন্তু মুখ দেখে মনে হলো না কিছু বুঝেছে।

কনসীলের ভাঙা ভাঙা ইংরেজি জানা ছিল। সেই বিদ্যেটুকু প্রয়োগ করে দেখতে বললাম ওকে। কিন্তু ফল হলো না। এরপর একই কথা আমি জার্মান ও ল্যাটিনে বলে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কিসের কি—ভস্মে ঘি ঢালছি যেন। আগন্তুক দু'জন নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা

বন্ধ করে দিল।

রাগে ফুঁসতে লাগল নেড, 'কোনদেশী জানোয়ার হারামীর বাচ্চাগুলো! চার চারটে ভাষার একটাও বুঝতে পারল না!'

'রাগলে লাভ হবে না, নেড,' শান্ত করার চেষ্টা করলাম আমি। 'যতক্ষণ না জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে আলাপ করছি ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে। আগে জানতে হবে আমাদের কি ধরনের লোক এরা।'

'তা আমার জানার বাকি নেই,' গজ গজ করতে লাগল নেড, 'পাজির পা-ঝাড়া শয়তানগুলো।'

ঠিক এমনি সময় আবার দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল একজন পরিচারক। হাতে আমাদের জন্যে কিছু জামা-কাপড়। কি দিয়ে ওগুলো তৈরি বুঝতে পারলাম না। তবু তাড়াতাড়ি আমরা কাপড়গুলো পরে নিলাম। ফিরে গিয়ে খাবার নিয়ে এল পরিচারক। ধাতুনির্মিত প্লেট, কাঁটাচামচগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার। প্রত্যেকটা প্লেট আর চামচের উপর খোদাই করা কয়েকটি শব্দঃ

মোবিলিস ইন মোবিলি

এন.

খাবার যা দেয়া হলো সব মাছ। কি মাছ সেগুলো চিনলাম না। নেড আর কনসীল ততক্ষণে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে। আমিও যোগ দিলাম ওদের সাথে।

খাওয়ার পর পরই দু'চোখ জড়িয়ে এল ঘুমে। নেড আর কনসীল তক্ষুণি মেঝের কার্পেটে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাতে লাগল। আমার কিন্তু সহজে ঘুম এল না। হাজার রকম চিন্তা পাক খেতে থাকল মাথায়। এ কাদের হাতে পড়লাম আমরা? জলের অতল তলায়, অজানা অচেনা ভয়ঙ্কর সব প্রাণীদের সাথে ঘুরছে এ ডুবোজাহাজ ভাবতেই আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই এক সময় ঘুম নেমে এল চোখে।

কতক্ষণ ধরে ঘুমিয়েছি জানি না। তবে ঘুম যখন ভাঙল সব ক্লান্তি মুছে গিয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর।

তখনও ঘুমাচ্ছে নেড-কনসীল। ঘরের বাতাসটা একটু ভারি ভারি ঠেকল। ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় বেড়ানো যায় কিনা ভাবছি, এমন সময় ঘরের কোন অদৃশ্য ছিদ্র পথে এক ঝলক তাজা হাওয়া এসে চাঙ্গা করে তুলল শরীর মন।

খোলা হাওয়া গায়ে লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল নেড আর কনসীলের। চোখ কচলে, আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল ওরা।

'ঠেসে ঘুমিয়েছি,' হেসে বলল নেড, 'কিন্তু, প্রফেসর, দরিয়ার হাওয়া বইছে মনে হচ্ছে যেন?'

'হ্যাঁ। আর জাহাজে এভাবে বাতাস ঢোকার সময় যে আওয়াজ হয়েছিল তাকেই আমরা নারহোয়েলের শ্বাস নেবার শব্দ ভেবেছিলাম।'

'কিন্তু এখন বাজে ক'টা? মনে হচ্ছে রাতের খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। খিদেয় তো চোঁ চোঁ করছে পেট।'

'কিন্তু ওদের সময় না হলে খাবার আসবে না,' উত্তর দিল কনসীল। 'আমরা এ জাহাজে আছি যখন এর নিয়ম কানুন মেনেই চলতে হবে।'

এরপর অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু কারও পাত্তা নেই। খিদের চোটে ক্রমেই-

অবস্থা সঙ্গিন হয়ে উঠছে। পুরো খেপে গেছে নেড।

আরও প্রায় দু'ঘন্টা কাটল। রাগের চোটে গর্জন করছে নেড। শেষ পর্যন্ত বাইরে থেকে দরজার তালা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। আগের পরিচারকটি ঢুকল ভেতরে।

লাফ দিয়ে উঠল নেড। ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরল সে পরিচারকটির। কনসীল গিয়ে নেডের হাত থেকে পরিচারকটিকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, আমিও এগিয়ে গেলাম। ঠিক সেই সময় দৈববাণীর মত শান্ত, গম্ভীর গলায় ফরাসীতে কথা বলে উঠল কেউ।

'শান্ত হও, নেডল্যাণ্ড। প্রফেসর অ্যারোনাক্স, দয়া করে আমার কথা একটু শুনবেন কি?'

নয়

চমকে উঠে পরিচারকটিকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল নেড। আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম। মুখে অবিচলিত গাম্ভীর্য নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে লম্বা, স্বাস্থ্যবান একজন লোক। বেশভূষা দেখে এক নজরেই বুঝলাম জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমরা ফিরতেই দৃঢ় পদক্ষেপে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক। প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে বেরিয়ে গেল পরিচারকটি।

টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে শান্ত স্বরে বলে চললেন ক্যাপ্টেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ফরাসী, জার্মান, ইংরেজি, ল্যাটিন চারটে ভাষাই জানি। প্রথমেই আপনাদের সাথে দেখা করে কথা বলতে পারতাম। কিন্তু আপনাদেরকে ভালভাবে জানার জন্যে তা করিনি। আপনাদের পরিচয় জানা আছে আমার।' আমার দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'আপনি প্যারিস মিউজিয়ামের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক মঁশিয়ে অ্যারোনাক্স, ওটি আপনার চাকর কনসীল। আর ও হলো ক্যানাডার সর্বশ্রেষ্ঠ হারপুনার, নেডল্যাণ্ড।'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন ক্যাপ্টেন, 'মানুষের সমাজ থেকে দূরে, বহু দূরে নির্জনে বাস করছিলাম আমি। কিন্তু আমার নির্জন-বাসকে বিঘ্নিত করেছেন···।'

'নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত সেটা, ক্যাপ্টেন।' বাধা দিয়ে বললাম আমি।

'অনিচ্ছাকৃত! অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন যে সাগরময় আমার পিছু ধাওয়া করে ফিরেছে তা অনিচ্ছাকৃত? আপনাদের নিক্ষিপ্ত গোলা অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমার জাহাজকে আঘাত করেছে? অনিচ্ছাকৃতভাবেই কি হারপুন ছুঁড়ে মেরেছে নেডল্যাণ্ড?'

'কিন্তু আপনার জাহাজকে অতিকায় নারহোয়েল ভেবে তা করা হয়েছে।'

বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে। তেমনি শান্ত গলায় বললেন তিনি, 'প্রফেসর, আপনি কি বলতে চান, এটা কোন নারহোয়েল নয়, ডুবোজাহাজ, এ কথা জানলে আপনারা ছেড়ে দিতেন?'

একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। কারণ ডুবোজাহাজ জানলে আরও উন্নত

মানের কামানের গোলা মেরে এটাকে ধ্বংস করে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট।

'সুতরাং, বুঝতেই পারছেন,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'আপনাদের শত্রু হিসেবে বিবেচনা করার যথেষ্ট কারণ আছে আমার।'

এ কথারও উত্তর দেয়া নিরর্থক জেনে চুপ করে রইলাম।

'আপনাদের নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি আমি। ইচ্ছে করলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি সাগরে।'

'তা পারেন,' বললাম আমি, 'তবে তা সুসভ্য মানুষের কাজ হবে না।'

'প্রফেসর,' গলার স্বর হঠাৎ বদলে গেল ক্যাপ্টেনের। 'সভ্য মানুষ বলতে আপনি যা বোঝেন আমি তা বুঝি না। মানুষের তৈরি সমাজের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। কাজেই আপনাদের তথাকথিত সভ্য মানুষের নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য নই আমি।'

বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর ক্যাপ্টেন বললেন, 'তবে মানুষের প্রতি দয়া দেখানো প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। তাই আমি ঠিক করেছি ভাগ্যচক্রে আমার জাহাজে যখন এসেই পড়েছেন, থাকবেন আপনারা এখানে। স্বাধীন ভাবেই থাকবেন, তবে একটি শর্তে।'

'কি শর্ত?' সাথে সাথেই জানতে চাইলাম আমি।

'কোন বিশেষ কারণে হয়তো কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিনের জন্যে একটা কেবিনে বন্দী থাকতে হবে আপনাদের। এবং কোনদিন এ জাহাজ ছেড়ে আপনাদের পরিচিত পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবেন না।'

'অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাদের উপর চরম নিষ্ঠুরতা করছেন আপনি, ক্যাপ্টেন।'

'আসলে হৃদ্যতা দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনারা আমাকে ধ্বংস করে দেবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তার বিনিময়ে আমি আপনাদের প্রাণে বাঁচিয়ে রাখছি, এই কি যথেষ্ট নয়?' একটু থেমে আবার বললেন, 'তবে এখানে থাকতে আপনাদের খারাপ লাগবে না, প্রফেসর। এক অপূর্ব, আশ্চর্য সুন্দর দেশের সন্ধান পাবেন এখানে আপনারা।'

'আপনার নামটা জানতে পারি কি, ক্যাপ্টেন?'

'আমাকে ক্যাপ্টেন নিমো বলে ডাকবেন। আর আমার জাহাজের নাম "নটিলাস"।' হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'খাবার সময় হয়ে গেছে।'

পরিচারককে ডাকলেন ক্যাপ্টেন। সে এলে সেই অদ্ভুত ভাষায় কি আদেশ দিলেন। তারপর নেড আর কনসীলের দিকে ফিরে বললেন, 'কেবিনে তোমাদের খাবার দেয়া হয়েছে। এর সাথে যাও।'

আমার দিকে ফিরে বললেন, 'প্রফেসর, আমাদের নাস্তাও দেয়া হয়েছে। দয়া করে আসুন আমার সাথে।'

বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত একটা সরু পথ দিয়ে কিছুদূর যেতেই সামনের একটা দরজা খুলে গেল। সুসজ্জিত একটা ডাইনিংরুমে এসে ঢুকলাম আমরা। ঘরের টেবিল, চেয়ার, দামি পোর্সেলিনের বাসনপত্র সমস্তই ক্যাপ্টেনের সুন্দর রুচির পরিচয় দিচ্ছে। আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন তিনি।

টেবিলে দেয়া খাবারগুলো সবই সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর মাছ থেকে তৈরি। অদ্ভুত একটা গন্ধ থাকা সত্ত্বেও খেতে ভালই লাগছিল।

'নির্ভয়ে এসব খাবার খেতে পারেন,' খেতে খেতে বললেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'এগুলো সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। আর এ খেয়ে আমাদের কোনদিন অসুখ করেনি।'

'আচ্ছা, সমস্ত খাবার কি সাগর থেকেই পাওয়া?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। সমুদ্রই আমাদের চাহিদা মেটায়। কখনও জাল ফেলে, কখনও শিকার করে চাহিদা মেটাই আমি। সাগরের বিস্তীর্ণ রাজ্যে আমাদের ভোগ্য বস্তুর কোন অভাব নেই। ওই যে, গোশতটা—ওটা কচ্ছপের। আর এই যে এক রকম সামুদ্রিক প্রাণীর দুধ থেকে তৈরি ক্ষীর। উত্তর সাগরের এক রকমের মাছ থেকে পাওয়া যায় ওই চিনি।'

খাওয়ার পর ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'প্রফেসর, যদি নটিলাসকে ঘুরে দেখার ইচ্ছে থাকে, সানন্দে নিয়ে যেতে পারি আপনাকে।'

প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ডাইনিংরুম থেকে লাইব্রেরিতে এসে ঢুকলাম। দেখার মত লাইব্রেরিটা। দামী আবলুস কাঠের তৈরি বুক শেলফে থরে থরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য মূল্যবান বই।

'ক্যাপ্টেন নিমো,' বিস্ময় গোপন করতে পারলাম না আর, 'আপনার এই লাইব্রেরি পৃথিবীর যে-কোন লাইব্রেরিকে হার মানাতে বাধ্য। সাগরের তলায় এই ডুবোজাহাজে এত বড় লাইব্রেরি কেউ তৈরি করতে পারে কল্পনা করাও কঠিন। ছ'সাত হাজার বই নিশ্চয়ই হবে এখানে।'

'বার হাজার। আপনার ইচ্ছেমত এখানে পড়াশোনা করতে পারেন, প্রফেসর। আর এটা শুধু রিডিংরুমই নয়, স্মোকিং রুমও।'

'স্মোকিং রুম? মানে হ্যাভানার সাথে এখনও যোগাযোগ রেখেছেন?'

'মোটেই না। এটা খেয়ে দেখুন।' চুরুটের মত একটা জিনিস আমার হাতে দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো, 'হ্যাভানা থেকে আসেনি এটা। কিন্তু সমঝদার হলে গুণ বুঝতে পারবেন।'

চুরুটে আগুন লাগিয়ে টান দিয়েই বলে উঠলাম, 'চমৎকার! এ তো তামাকের তৈরি বলে মনে হয় না।'

'ঠিক ধরেছেন। এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদ এটা।'

এরপর ড্রইংরুমে ঢুকলাম আমরা। ড্রইংরুম না বলে মিউজিয়াম বলা উচিত। আধুনিক আর প্রাচীন ভাস্কর্য থেকে শুরু করে সবরকম পেইন্টিং-এর মূল্যবান সব সংগ্রহে কামরাটা ভরপুর। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম।

সুন্দর কাঁচের বাক্সে সংগৃহীত হয়েছে সাগরের দুষ্প্রাপ্য সব উদ্ভিদের নমুনা। আর এক জায়গায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা রঙের নানা আকারের মুক্তা। পায়রার ডিমের মত বড় মুক্তাও রয়েছে। এসবের বর্তমান বাজার মূল্য কত হতে পারে তা আমার কল্পনার বাইরে।

'এসব ঝিনুক আর মুক্তা নিজের হাতে সংগ্রহ করেছি। পৃথিবীর এমন কোন সাগর নেই যা নিয়ে গবেষণা করিনি আমি।'

'ইউরোপের কোন মিউজিয়ামে এসব জিনিস পাওয়া যাবে না। আশ্চর্য আপনার সংগ্রহ, ক্যাপ্টেন।'

'এবার চলুন, আপনার কেবিনটা দেখে নেবেন।'

সুন্দর একটা ঘরে আমাকে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। সুন্দর বিছানা, ড্রেসিং টেবিল এবং আরও দু'একটা আসবাব পত্রে সাজানো ঘরটা।

আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম ক্যাপ্টেনকে।

'আপনার ঘরের পাশেই আমার ঘর, তার পাশেই ড্রইংরুমটি।'

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার ঘরে ঢুকলাম। অত্যন্ত সাধারণভাবে ঘরটি সাজানো। একটা লোহার খাট, একটা টেবিল আর প্রসাধনের দু'একটা জিনিস ছাড়া আর কিছু নেই ঘরে।

একটা চেয়ারে আমাকে বসতে অনুরোধ করে আর একটা চেয়ারে বসলেন ক্যাপ্টেন। দেয়ালে টাঙানো যন্ত্রপাতিগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এর ভেতর কিছু যন্ত্রপাতি আপনি চেনেন। যেমন—থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, হাইড্রোমিটার, স্টর্ম গ্লাস, কম্পাস, ক্রনোমিটার ইত্যাদি। আর এ কাঁচগুলোর সাহায্যে দিগন্তরেখার ঠিক কোন জায়গায় ভেসে উঠল নটিলাস তা বুঝতে পারি।'

'এর সবগুলো যন্ত্রপাতিই চিনি, ক্যাপ্টেন। ঐ ম্যানোমিটারও। কিন্তু নটিলাস চলে কিসের বলে?'

'বিদ্যুৎ।'

'বিদ্যুৎ?' বিস্মিত হলাম আমি।

'হ্যাঁ। তবে একটু আলাদা ধরনের বিদ্যুৎ। আপনি জানেন এক হাজার গ্রাম সাগরের পানিতে শতকরা ৯৬½ভাগ পানি, ২½ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড আর বাকিটা ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম ক্লোরাইড। এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটুকু নিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করি আমি।'

'কিন্তু শ্বাস নেবার জন্যে বাতাস কোথায় পান?'

'প্রয়োজন হলে তৈরি করে নিতে পারি, তবে দরকার হয় না। বাতাসের দরকার হলেই পানির উপর ভেসে উঠি। আসুন আরও কিছু দেখাচ্ছি আপনাকে।'

এরপর একটা ঘরে এসে পৌঁছলাম। দু'ভাগে ভাগ করা সেটা। একটা অফিস, অন্যটা ইঞ্জিনরুম।

'বুন্‌সেনের যন্ত্রের সাহায্যে কাজ করি আমি,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'রুমকফোর চেয়ে এগুলোর জোর অনেক বেশি। প্রতি সেকেণ্ডে নটিলাসের উনিশ ফুট ব্যাসের চাকাটা প্রায় ১২০ বার ঘোরে। আর এতে ঘণ্টায় আশি মাইল গতিতে চলতে পারে জাহাজটা।'

'তা সম্ভব। অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন থেকে এর গতিবেগ স্বচক্ষে দেখেছি আমি। আচ্ছা, কেমন করে বোঝেন সাগরের কোন এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন, কিভাবে নটিলাসকে ডাইনে বা বাঁয়ে ঘোরান, গভীর পানিতে প্রতিরোধ শক্তি যেখানে বেশি, আবহাওয়াও অন্যরকম, সেখানে কি করে চলেন? পানির উপর ভেসেই বা ওঠেন কি করে?' একটু থেমে বললাম, 'একটু বেশি মাত্রায় কৌতূহল প্রকাশ করছি কি, ক্যাপ্টেন?'

'না। এটা স্বাভাবিক।' একমুহূর্ত দ্বিধা করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'চিরকালই যখন এখানে থাকতে হচ্ছে তখন জানতে বাধা কি? আসুন, আমার রিডিংরুমে। সেখানেই বুঝিয়ে দেব সব।'

দশ

ধূমপান করতে করতে নটিলাসের নকশাটা আমাকে খুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন।

'দেখুন, প্রফেসর, নটিলাসের আকৃতি অনেকটা চুরুটের মত। লম্বায় ২৩২ ফুট। গোড়ার দিকটা চওড়ায় ২৬ ফুট। সম্পূর্ণ আয়তন ১০.১ মি. ৪৫ সে. মি.। ওজন ১৫০০ টন।

'কাঠামোটা দুই অংশে বিভক্ত। দুটো অংশ ইংরেজি T এর মত লোহা দিয়ে আটকানো। এতে মজবুত হয়েছে জাহাজটা। কোন অংশই দুর্বল নয় এর। সাগরের রুদ্র রোষকে ভয় করেনা নটিলাস।

'দুটো অংশের প্রথমটি ইস্পাতের—আড়াই ইঞ্চি পুরু, ওজন ৩৯৪ টন। দ্বিতীয়টি বিশ ইঞ্চি উঁচু, দশ ইঞ্চি পুরু, ওজন ৬২ টন। ইঞ্জিনসহ অন্যান্য সমস্ত যন্ত্রপাতির ওজন ৯৬১.৬২ টন। পানিতে যখন ভাসে নটিলাসের দশ ভাগের এক ভাগ দেখা যায়।'

'কিন্তু পানিতে ডোবেন কি করে?'

'একটা কথা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার, প্রফেসর, প্রায় সব বস্তুরই ডুবে যাবার প্রবণতা আছে। নটিলাসকে ডুবিয়ে রাখার জন্যে কতটা বাড়তি চাপ লাগবে সেটা হিসেব করে বের করেছি আমি। একশো টন পানি ধরে রাখার জন্যে একটা ট্যাঙ্ক আছে জাহাজে। ট্যাঙ্কে পানি ভরতে শুরু করলেই ডুবতে থাকে জাহাজ। খুশি মত পানির নিচে ওঠানামা করতে পারি আমি এভাবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু হাজার গজ নিচে প্রচণ্ড পানির চাপের মধ্যে চলে কি করে নটিলাস?'

'সে শক্তি শুধু বিদ্যুৎই দিতে পারে। তাছাড়া আমার ইঞ্জিনের ক্ষমতা অসীম। ইচ্ছে করলে সাগরের পাঁচ সাত মাইল নিচেও যেতে পারি আমি।'

'সে কি করে সম্ভব?'

'জাহাজকে ডান দিক থেকে বাঁয়ে ঘোরাতে রাডারের সাহায্য নিই আমি। পাশে লাগানো দুটো পাখার সাহায্যে নটিলাসকে সব দিকে ঘোরানো যায়। পাখা দুটো জাহাজের সাথে সমান্তরাল রাখলে জাহাজ সোজা চলে। আর কাত করে ইচ্ছে মত ডোবাতে বা ভাসাতে পারি। তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে চাইলে ট্যাঙ্ক থেকে খুব জোরে পানি বের করে দিলেই হলো। গ্যাস পোরা বেলুনের মত উপরে উঠে যাবে জাহাজ।'

'চমৎকার! কিন্তু দিক নির্ণয় করেন কি করে?'

'জাহাজ চালকের ছোট্ট কামরাটার চারদিকে বিশেষ এক ধরনের কাঁচ লাগানো আছে। পানির চাপে এ কাঁচ ভেঙে যায় না। চালকের ঘরের পেছনের একটা বৈদ্যুতিক রিফ্লেকটরের আলোয় এক মাইল দূর পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যায় সাগরের পানি।'

'আশ্চর্য!' উচ্ছ্বাস দমন করতে না পেরে বলে উঠলাম, 'এতক্ষণে বুঝেছি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন থেকে এই আলোকেই আমরা ফসফরাসের আলো বলে ভেবেছি। সত্যি, ক্যাপ্টেন, আপনার নটিলাস এক অপূর্ব সৃষ্টি!'

'ঠিক। আর নটিলাসই হলো আমার প্রাণ। এর নাবিকদের কোন ভয় নেই। সমস্ত জাহাজটা দুর্ভেদ্য লোহার চাদরে মোড়া, এতে দাহ্য জিনিস কিছু নেই, কাজেই আগুন লাগার ভয়ও নেই। কয়লা ফুরাবার ভয় নেই, কারণ সব কাজ চলে বিদ্যুৎ শক্তিতে। পানির তলায় ঝড় ঝঞ্ঝা এর কিছু করতে পারে না। এর কথা ভাবলে গর্বে বুক ভরে ওঠে আমার। কারণ একাধারে এর স্রষ্টা, নিয়ন্তা এবং চালক আমি।'

'এমন বিরাট একটা অসাধ্য সাধন একা কি করে করলেন আপনি?'

'যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছে এ-জন্যে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে জোগাড় করা হয়েছে এর এক একটা অংশ। জাহাজের তলাটা এসেছে ক্রয়সট থেকে, আর লোহার পাতগুলো লিভারপুল থেকে। স্ক্রু তৈরি হয়েছে গ্ল্যাসগোতে, পানির ট্যাঙ্কগুলো তৈরি করেছে প্যারিসের কেল অ্যাণ্ড কোম্পানি, প্রুশিয়ার ক্রাপ কোম্পানি বানিয়েছে ইঞ্জিন। বাকি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো এসেছে নিউ ইয়র্কের হার্ট ব্রাদার্স থেকে। এসব কোম্পানি, সবাই আমার কাছ থেকে অর্ডার পেয়েছে বিভিন্ন নামে।'

'কোথায় বসে বানালেন এটাকে?'

'মহাসাগরের মাঝে এক মরুদ্বীপে। কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে এই দুঃসাহসিক কাজটা করেছি আমি। কাজ শেষ হবার পর আগুন ধরিয়ে সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিয়েছি।'

'নটিলাসকে তৈরি করতে খরচ তো অনেক পড়েছে, তাই না?'

'তা তো পড়বেই। সাধারণ লোহার জাহাজে খরচ পড়ে টন পিছু ৪৫ পাউণ্ড। নটিলাসের ওজন ১৫০০ টন। এ হিসেবে খরচ পড়ার কথা ৬৭৫০০ পাউণ্ড। খুরচা অংশগুলো জোগাড় করতে খরচ পড়েছে ৮০,০০০ পাউণ্ড। আর ভেতরের জিনিসপত্রের দাম নিয়ে সবসুদ্ধ খরচ দাঁড়ায় ২,০০,০০০ পাউণ্ড।'

'আর মাত্র একটা প্রশ্ন, ক্যাপ্টেন, এবং এটাই শেষ।'

'বলুন।'

'বিরাট ধনী আপনি, না ক্যাপ্টেন?'

'ফ্রান্সের সমস্ত জাতীয় ঋণ শোধ করে দিলেও টাকা ফুরাবে না আমার, প্রফেসর।'

নির্বাক বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মানুষটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি।

এগারো

পৃথিবীর সমস্ত জলরাশিকে পাঁচটি বড় বড় ভাগে ভাগ করা যায়। সুমেরু, কুমেরু, ভারত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর।

প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান উত্তর দক্ষিণে দুই মেরু বলয়ের ভেতর

এবং পশ্চিমে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। সবচে' শান্ত সাগর এটা। ব্যাপক স্রোত কিন্তু ধীর। এই প্রশান্ত মহাসাগরেই ঢুকলাম একদিন। ক্যাপ্টেন আমাকে বললেন পানিতে ভেসে উঠতে যাচ্ছেন তিনি। এই বলে একটা বৈদ্যুতিক বোতাম তিনবার টিপলেন। ট্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে যেতে থাকল পানি। কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল এক সময় ম্যানোমিটারের কাঁটা।

'এসে গেছি আমরা,' বললেন ক্যাপ্টেন। জাহাজের মাঝখানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম।

দাঁড়াবার জন্যে রাখা উঁচু এই অংশটি পানির মাত্র তিন ফুট উপরে ভেসে আছে। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট্ট দুটো খুপরি ঘর। একটি পুরু কাঁচে ঘেরা চালকের ঘর, অন্যটিতে অন্ধকার সাগরকে আলোকিত করার সেই বিশাল সার্চ লাইট।

শান্ত, সুন্দর সমুদ্র, নির্মল আকাশ। কুয়াশা না থাকায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দিগন্তরেখা। জাপানের উপকূল এগিয়ে আসছে। ক্যাপ্টেন সহ সেলুনে এসে ঢুকলাম। আবার ডুব দিল নটিলাস।

'আমাদের নির্দিষ্ট পথ হচ্ছে পূর্ব উত্তর-পূর্ব। ২৫৬ ফুট নিচ দিয়ে যাব এখন আমরা। ওই যে বড় বড় কয়েকটা ম্যাপ রেখে গেলাম, বোঝার চেষ্টা করুন ওগুলো।' বলে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

কাজে ডুবে রইলাম এক ঘন্টা। দারুণ মজা পাচ্ছি কাজটাতে। টেবিলের বিশাল ম্যাপটায় চোখ বুলাতে বুলাতে অজ্ঞাত সব তথ্য স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল আমার কাছে। একটু পর রেখে দিলাম ম্যাপটা। সেলুনের কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। প্রশান্ত মহাসাগরের বিপুল জলরাশির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি এমন সময় সেলুনে ঢুকল নেডল্যাণ্ড আর কনসীল। সামনের অপরূপ দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে গেল ওরাও।

'কোথায় আমরা? কুইবেকের মিউজিয়ামে নাকি?' বলে উঠল নেড।

'না। এটা ক্যানাডা নয়, ডুবোজাহাজ নটিলাসে করে সাগরের নিচ দিয়ে চলেছি।'

'প্রফেসর,' নেড বলল, 'বলতে পারেন এ জাহাজে লোক কত? দশ, বিশ, একশো?'

'জানি না, নেড, তবে এ মুহূর্তে নটিলাসকে আক্রমণ করা বা এ থেকে পালানোর চেষ্টা না করাই উচিত। চারপাশে যা ঘটে দেখে যাও—'

'দেখে যাব?' চেঁচিয়ে উঠল নেড, 'একটা লোহার দুর্গে বন্দী আমরা। এখানে কার কি দেখার আছে?'

সাথে সাথে দিনের আলো নিভে গিয়ে আঁধারে ছেয়ে গেল চারদিক। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কি ঘটবে কে জানে? হঠাৎ দুটো চতুষ্কোণ ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল ঘরে। দুটো স্বচ্ছ পাত সরে গেল সামনে থেকে। বিশাল এক কাঁচের বেড়া দেখা গেল আমাদের সামনে। ভয় হলো ভেঙে যাবে বেড়াটা। কিন্তু না, শক্ত তারের জাল দিয়ে বেড়াটা মজবুত করে আটকানো। বাইরের সাগর আলোয় আলোকিত।

উজ্জ্বল আলোয় এক মাইল দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে সাগরের পানি। সে অপূর্ব দৃশ্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অত্যন্ত স্বচ্ছ হয় সাগরের পানি। সূর্যের

আলো সাগরের ১৫০ ফুটের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু নটিলাসের অত্যুজ্জ্বল আলোয় মনে হলো আমরা তরল আলোক মালায় ভর করে চলেছি।

'চেয়ে দেখো, নেড। যা দেখতে চেয়েছ তুমি।'

'অপূর্ব, অদ্ভুত!' স্বভাব ভুলে চেঁচিয়ে উঠল বদমেজাজী নেড, 'এরকম দৃশ্য দেখার জন্যে এ লোহার দুর্গে বন্দী থাকাও ভাল।'

জাহাজের চারপাশে বিচিত্র বর্ণের নানা আকারের মাছ দেখতে পেলাম। সবুজ রঙের ল্যাব্রে, পিঠে দুটো করে কালো দাগ টানা মুলেট, সাদা রঙের গোল লেজে গোলাপী ছোপওয়ালা গোবী, জাপানী স্ক্রমবাস, অ্যাকলোস্টোন, খুদে চোখওয়ালা ছ'ফুট লম্বা এক ধরনের সাপ, আরও কত কি!

সম্মোহিতের মত সেদিকে চেয়ে থাকলাম আমি। মাছগুলোর নাম ধাম জাত কনসীলের কাছে বলে যাচ্ছে নেড। আকাশে যত পাখি, পানিতে মাছের সংখ্যা তারচে' অনেক বেশি।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর লোহার পাতগুলো বন্ধ হয়ে গেল। সেলুনের কাঁচ দিয়ে আবার ঘরে প্রবেশ করল দিনের আলো। ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল ওই অপূর্ব দৃশ্যপট। দেয়ালে রাখা যন্ত্রপাতিগুলোর উপর চোখ পড়ল আমার। কম্পাসের কাঁটা তখনও পূর্ব উত্তর-পূর্ব দিকে নির্দিষ্ট। স্পিডোমিটারে দেখলাম পনের মাইল বেগে চলছে জাহাজ। ক্যাপ্টেনের জন্যে অপেক্ষা করলাম কিন্তু তিনি এলেন না। ঘরে ফিরে গেল নেড আর কনসীল। নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। টেবিলে ঢেকে রাখা হয়েছে রাতের খাবার। ঢেউয়ের কল্লোল শুনতে শুনতে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেলাম।

বারো

এরপর বেশ অনেকদিন ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা পাইনি। অথচ ২৭ ডিসেম্বর তিনি যখন আমার বসার ঘরটায় হাজির হলেন মনে হতে লাগল যেন মাত্র পাঁচ মিনিট আগেও তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। মানচিত্র আর চার্ট খুলে নটিলাসের গতিপথ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিলাম তখন। ক্যাপ্টেন কাছে এসে ম্যাপের একটা জায়গায় আঙুল রেখে বললেন, 'ভ্যানিকোরো'।

এই সেই ভ্যানিকোরো দ্বীপ। ডুমন্ট ডি উরভিল যার নাম দিয়েছিলেন আইল দ্য রেচের্চ। দূর থেকে ম্যানগ্রোভ গাছের ছায়ায় দেখা গেল কয়েকজন অসভ্য লোককে। দ্বীপের আদিম অধিবাসী। অবাক হয়ে আমাদের এই অদ্ভুত জলযানটির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা।

সেদিন রাতেই ভ্যানিকোরো পেরিয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে পাপুয়া দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলল নটিলাস। জাপান উপসাগরে আমাদের যাত্রার শুরু থেকে জানুয়ারির দু'তারিখ পর্যন্ত আমরা ১১,৩৪০ মাইল অতিক্রম করেছি। ঠিক এ সময় আমাদের জাহাজ যেখানে, ঠিক সেখানে ১৭৭০ সালের ১০ জুন ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ এক প্রবাল স্তূপে লেগে চূর্ণ হয়ে যায়। প্রবাল প্রাচীরও সেখান থেকে মাত্র কয়েক

মাইল দূরে। প্রবাল স্তূপটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু নটিলাস সে-সময় পানির নিচ দিয়ে চলায় দেখতে পেলাম না।

প্রবাল সাগর পেরোনর দু'দিন পরে বহুদূরে পাপুয়া দ্বীপের রেখা দেখা গেল। ক্যাপ্টেন নিমো জানালেন টোরেস প্রণালী দিয়ে তিনি ভারত মহাসাগরের দিকে চলেছেন।

প্রণালীটি অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ আর শিলাখণ্ডে ভরা। এখান দিয়ে জাহাজ নেয়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। গতি কমিয়ে দেয়া হলো নটিলাসের। পানির উপর ভেসে ভেসে চলছে এখন জাহাজ।

আমি, নেড আর কনসীল ডেকে উঠে এলাম। নটিলাসের চারদিকে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। জায়গায় জায়গায় প্রবাল প্রাচীর দেখা যাচ্ছে।

'জায়গাটা ভাল না।' বলল নেড।

'তাই খুব সাবধানে জাহাজ চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন নিমো।' বললাম আমি।

তখন দুপুর প্রায় তিনটে। হঠাৎ প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লাম আমি। একটা খাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে নটিলাস। আমি উঠে দাঁড়ানোর আগেই প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নিমো আর তাঁর কয়েকজন সঙ্গী। সেই বিজাতীয় ভাষায় ওদের সাথে কথা বলছেন তিনি।

যেখানটায় নটিলাস আটকে গেছে সেখানে পানির স্রোত মাঝারি, ফলে ভাসানো যাচ্ছে না জাহাজকে। জাহাজের তেমন ক্ষতি হয়নি। তলাটা ঠিকই আছে। তবে তাড়াতাড়ি নড়াতে না পারলে চিরকালের জন্যে এখানেই আটকে থাকতে হবে।

'দুর্ঘটনা ঘটল, না, ক্যাপ্টেন?' এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা। প্রফেসর, এত সহজে হার মানে না নটিলাস। আজ চার তারিখ, পাঁচ দিনের ভেতরই পূর্ণিমা। চাঁদের আকর্ষণে প্রবল জোয়ার আসবে সাগরে। সহজেই ভাসিয়ে নেবে নটিলাসকে।' দৃঢ়তার সঙ্গে কথাগুলো বলে সঙ্গীদের নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন।

নেড জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'কি বুঝলেন?'

'বুঝলাম ন'তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

কাঁধ ঝাঁকাল নেড, 'কিন্তু আমি বলছি, এই হতচ্ছাড়া জাহাজটা আর ভাসবে না কোনদিন। ওজন দরে বিক্রি করে দেয়া ছাড়া আর কিছু করা যাবে না এটাকে। এবার আমাদের ক্যাপ্টেন নিমোর কাছ থেকে বিদায় নেয়াই ভাল।'

'তা হয় না, নেড। চারদিন পরই জানতে পারব কি হবে না হবে। ফ্রান্স কি ইংল্যাণ্ডের কাছে হলে পালানোর কথা ভাবা যেত, এই পাপুয়া দ্বীপের কাছে সে কথা চিন্তাও করা যায় না।'

'দ্বীপে নামতে আমাদের বাধা কি? গাছপালা আছে, আর আছে খাওয়া যায় এমন অনেক প্রাণী।'

'কথাটা ঠিক,' আবদার করল কনসীল, 'স্যার কি ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমাদের দ্বীপে নামার অনুমতি আদায় করতে পারেন না?'

'বলে দেখতে পারি।'

'তাহলে বলেই দেখুন।'

বললাম। বিনা দ্বিধায় সানন্দে অনুমতি দিলেন ক্যাপ্টেন।

পরদিন সকাল আটটায় কুড়াল আর বন্দুক নিয়ে তীরে নামলাম আমরা তিনজন। সাগর শান্ত, বাতাসও মন্থর। জেল থেকে ছাড়া পাওয়া কয়েদীর মত খুশিতে লাফাচ্ছে নেড। বলল, 'আজ অনেকদিন পর গোশত খাব। মাছ খেতে খারাপ তা বলছি না, তবে ঝলসানো হরিণের মাংসের সাথে তার তুলনাই হয় না।'

'কথা শুনেই জিভে পানি আসছে আমার,' কনসীল বলল।

'দেখা যাক কি আছে জঙ্গলে।' বললাম আমি, 'শিকার করতে এসে না আবার নিজেরাই শিকার হয়ে যাই।'

দাঁত খিঁচিয়ে বলল নেড, 'আর কিছু না পেলে বাঘ তো পাব? তাই খাব আজ।'

তেরো

অপূর্ব সুন্দর দ্বীপটা। ঘন জঙ্গলে ছাওয়া। বিশাল সব আকাশ ছোঁয়া গাছ। বড় গাছগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে ফার্ন জাতীয় এক ধরনের লতানো উদ্ভিদ।

এসব দিকে মোটেই নজর নেই নেডের। খুঁজে পেতে একটা নারকেল গাছ পেয়ে কয়েকটা নারকেল পাড়ল। একটা কেটে ঢক ঢক করে পানি খেয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার!'

'সত্যিই অপূর্ব!' বলল কনসীল, 'গোটা কয়েক নারকেল জাহাজে নিয়ে গেলে আপত্তি করবেন না হয়তো ক্যাপ্টেন।'

'তা করবেন না, তবে এগুলো খাবেনও না,' বললাম আমি।

'ভালই হবে,' বলল নেড, 'আমরাই খাব সব।'

নেড আর একটা গাছে চড়তে যাচ্ছে দেখে আমি বললাম, 'নেড, এক গাদা নারকেল দিয়ে জাহাজ বোঝাই করার আগে দেখা উচিত এরচেয়ে ভাল কিছু দ্বীপে আছে কিনা। নারকেলের চাইতে টাটকা শাকসব্জি হলে ভাল হয় না?'

'ঠিক বলেছেন,' বলল কনসীল। 'সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম জঙ্গলটা। ঘুরতে ঘুরতে উষ্ণ উপত্যকার রুটিফল গাছের সন্ধান পেয়ে গেলাম। মালয়ে একে বলে রিকে।

নেডও চেনে এ ফল। পৃথিবীর নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে এসব খাদ্য আর তার প্রস্তুত প্রণালী ভালমতই রপ্ত আছে তার। রুটিফলগুলো দেখেই লাফিয়ে উঠল সে।

চট্ করে আগুন তৈরি করে ফেলল নেড। আমি আর কনসীল কিছু ফল পেড়ে নিয়ে এলাম। ছুরি দিয়ে সেগুলো পাতলা করে কাটতে কাটতে নেড বলল, 'দেখবেন, কি অপূর্ব লাগে এগুলো খেতে। অনেক দিন পর খাওয়া হচ্ছে বলে আরও ভাল লাগবে।'

কিছুক্ষণ পোড়াবার পর ফলগুলোর কাটা টুকরোগুলোর বাইরের দিকটা লালচে হয়ে এল। সত্যি অপূর্ব লাগল ওগুলো খেতে।

আবার ঘুরতে শুরু করলাম জঙ্গলে। বাঁধাকপি আর বীন পেয়ে গেলাম প্রচুর।

বিরাট বোঝা নিয়ে জাহাজে ফিরলাম সেদিন। কিন্তু তাতেও মন ভরছে না নেডের।

আমাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ এল না। মনে হলো সমস্ত জাহাজটা জনশূন্য। মালপত্তরগুলো নিয়ে নিজের ঘরে গেলাম। রাতের খাওয়া শেষ করেই শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরে আবার নৌকা নিয়ে রওনা দিলাম দ্বীপের উদ্দেশ্যে। দ্বীপে নেমে আগে আগে চলতে শুরু করল নেড, আমরা অনুসরণ করলাম তাকে।

দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় এগিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জমির উপর উঠল সে। এখানে জঙ্গলটা আগের দিনেরটার চেয়ে ঘন। মাথার উপর উড়ছে মাছরাঙা কিন্তু কাছে আসছে না। মানুষের কাছে যাওয়া নিরাপদ নয় জানে। মানুষের সঙ্গে পরিচিত ওরা। দ্বীপে বাস না করলেও মাঝে মাঝে মানুষেরা এখানে আসে, বোঝা গেল।

বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে একটা ছোট বনের ধারে এলাম। বিচিত্র রং আর আকারের অসংখ্য পাখির মেলা চারপাশে। সমস্ত জায়গাটা ওদের ডাকে মুখরিত হয়ে আছে।

বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক জায়গায় ঘন ঝোপ দেখলাম। এসব ঝোপে দেখা গেল বার্ড-অফ-প্যারাডাইস নামে বিখ্যাত এক ধরনের অতি সুন্দর পাখি। বেশ কয়েকবার ওদের দিকে গুলি ছুঁড়লাম আমরা। কিন্তু একটাও লাগাতে পারলাম না।

সকাল এগারটা বাজে অথচ এখনও পেটে পড়েনি কিছু। খিদেয় জ্বলছে পেট। ঠিক এই সময় কনসীল গুলি করে দুটো বুনো পায়রা মারতে পারল। আগুন জ্বেলে পায়রা দুটো ঝলসে খেলাম। ঠিক করলাম শিকার অভিযান চালিয়ে যাব। নেডের ভারি ইচ্ছে একটা চতুষ্পদ প্রাণীর মাংস খাওয়া, আর আমার ইচ্ছা একটা বার্ড-অফ-প্যারাডাইস ধরা। ঠিক করলাম এবার সাগরের দিকে ফিরে গিয়ে শিকার করব।

আরও এক ঘন্টা হাঁটার পর একটা সাবু গাছের জঙ্গলে পৌছলাম। কয়েকটা নিরীহ সাপ চোখে পড়ল। একটা বার্ড-অফ-প্যারাডাইস আমার হাতের কাছে এসেও পালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু নিচু হয়ে খপ্ করে সেটাকে ধরে ফেলল কনসীল। লম্বায় সেটা প্রায় তিন ফুট হবে। এত সুন্দর পাখি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

বেলা দুটোর দিকে একটা শুয়োর শিকার করে বসল নেড। সাথে সাথেই শুয়োরটার ছাল ছাড়িয়ে কাটলেট তৈরি করতে লেগে গেল সে।

এরপর শুরু হলো ক্যাঙারু শিকার। জঙ্গল ঠেঙাতেই ভয় পেয়ে ক্যাঙারুগুলো বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু পালাবার আগেই নেড আর কনসীলের গুলিতে ধরাশায়ী হলো দুটো ক্যাঙারু।

'দারুণ, প্রফেসর!' আনন্দে অধীর হয়ে উঠল নেড, 'কি কপাল করেই এসেছি আজ। আর ওই বোকাগুলোর কথা ভাবুন একবার। ব্যাটারা চাখতে পারল না এক টুকরোও।'

ভুরিভোজের পর রাতটাও ওই দ্বীপেই কাটানোর প্রস্তাব করল নেড। রাজি হলাম না। সন্ধে ছ'টা নাগাদ আমাদের নৌকার কাছে পৌছলাম। মাইল দুয়েক দূরে অন্ধকারে ভয়াবহ ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে নটিলাস। কালবিলম্ব না করে রাতের

খাবারের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নেড।

চমৎকার হলো রাতের খাওয়াটা। দুটো বন পায়রা আর রোস্ট করা গোশত ছাড়াও তালিকায় ছিল রুটিফল, আম, আনারস আর ডাবের পানি। পরম পরিতৃপ্তির সাথে ভোজনপর্ব শেষ করে ঢেকুর তুললাম।

'আজ যদি আর নটিলাসে নাই ফিরি তো কি এসে যায়?' বলল কনসীল।

'শুধু আজ কেন, কোনদিনই যদি আর না ফিরি কি ক্ষতি?' বলল নেড।

নেডের কথা শেষ না হতেই একটা পাথরের টুকরো এসে পড়ল আমাদের পায়ের কাছে।

চোদ্দ

পাথরটা কোত্থেকে এল ঠাওর করতে জঙ্গলের দিকে তাকালাম আমরা।

'আকাশ থেকে তো আর পাথর পড়ে না,' কনসীল বলল, 'ব্যাপার মনে হচ্ছে সুবিধের নয়।'

আর একটা পাথর এসে লাগল কনসীলের হাতে ধরা পায়রার গায়ে। মাটিতে পড়ে গেল সেটা। তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলাম।

'কারা করছে এরকম?' জিজ্ঞেস করল নেড, 'ভূত-টুত নাকি?'

'তাই,' উত্তর দিল কনসীল। 'এই দ্বীপের অসভ্য আদিবাসী এরা।'

'জলদি নৌকায় চল,' ছুটতে শুরু করলাম আমি।

পালানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। মাত্র ষাট সত্তর গজ দূরে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে জনা কুড়ি অসভ্য। হাতে তীর ধনুক।

আমাদের কাছ থেকে নৌকাটা ষাট গজের মত দূরে। পাথর আর তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে আসছে অসভ্যরা। এরকম বিপদেও খাবারের বোঝা ত্যাগ করল না নেড। এক কাঁধে মরা শুয়োর অন্য কাঁধে ক্যাঙারু নিয়ে নৌকার দিকে ছুট লাগিয়েছে সে। দু'মিনিটেই নৌকায় পৌঁছে চটপট ভাসিয়ে দিলাম নৌকা।

দু'রশি দূরত্বেও যাইনি, তীরের দিকে চেয়ে দেখলাম শ'খানেক অসভ্য কোমর পানিতে নেমে নানারকম অঙ্গভঙ্গি আর চিৎকার করছে। ভেবেছিলাম চিৎকার শুনে নটিলাস থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু আগের দিনের মতই বিরাট জাহাজটায় জনমানবের চিহ্ন দেখা গেল না।

নটিলাসে পৌঁছলাম। নৌকাটা জায়গামত রেখে জাহাজের ভেতর ঢুকলাম।

ক্যাপ্টেন নিমোর ঘরে ঢুকে দেখলাম একটা অর্গ্যানের ওপর হাত রেখে নিবিষ্ট মনে গুন গুন করছেন তিনি। প্রথম বার ডেকে সাড়া পেলাম না, দ্বিতীয়বার ডেকে হাত ছুঁতেই চমকে ফিরে তাকালেন তিনি, 'ওঃ, প্রফেসর, আপনি! শিকার ভাল হয়েছে তো?'

'তা হয়েছে। তবে খারাপ খবরও আছে। সাথে করে কতগুলো দ্বিপদ জীবকে ডেকে এনেছি আমরা।'

'দ্বিপদ জীব!' অবাক হলেন ক্যাপ্টেন।

'মানে, অসভ্য মানুষ।'

'অসভ্য?' ব্যঙ্গের সুরে বললেন ক্যাপ্টেন, 'প্রফেসর, এক অপরিচিত, অজ্ঞাত দ্বীপে পা দিয়ে আদিম অসভ্যতার দেখা পেয়ে অবাক হচ্ছেন। পৃথিবীর কোথায় নেই অসভ্যেরা? তা কতজনকে দেখেছেন দ্বীপে?'

'কমপক্ষে একশো।'

'প্রফেসর,' সামনের অর্গ্যানের বোতামে আঙুল রেখে বললেন ক্যাপ্টেন, 'এটা জানবেন, একশো কেন, পাপুয়া দ্বীপের সমস্ত অধিবাসীরা আক্রমণ করলেও আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

কথাটা বলেই সুরলহরীতে ডুবে গেলেন ক্যাপ্টেন। সারা ঘরটা ছেয়ে গেল বিষাদের সুরে। আমি চলে এলাম প্ল্যাটফর্মের ওপর। অসভ্যদের ভয় দূর হয়েছে, কিন্তু দেশের কথা,বাড়ির কথা মনে পড়তে থাকল অনেকক্ষণ ধরে।

পরদিন ৮ জানুয়ারি সকাল ছ'টায় আবার প্ল্যাটফর্মে উঠলাম, কুয়াশা কেটে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল পাপুয়া দ্বীপ। আজকে অসভ্যেরা সংখ্যায় বেড়ে গেছে পাঁচ-ছয় গুণ। সমুদ্র অগভীর বলে অনেকগুলো অসভ্য প্রবাল স্তূপ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। সুন্দর সুগঠিত চেহারা, চওড়া কপাল আর সাদা দাঁত। ফুটো করা কান থেকে বড় বড় হাড় ঝুলিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। সবাই প্রায় উলঙ্গ। দলের সর্দারেরা শুধু গলায় লাল সাদা পুঁতির মালা পরেছে। প্রত্যেকের হাতে তীর ধনুক আর ঢাল। একজন সর্দার নটিলাসকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখছিল। লোকটাকে সহজেই গুলি করতে পারতাম। কিন্তু ওরা আক্রমণ না করা পর্যন্ত চুপ করে থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম।

এগারটার দিকে জোয়ারের পানি বেড়ে যাওয়ায় দ্বীপে ফিরে গেল অসভ্যেরা। সংখ্যায় আরও বেড়েছে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হলো। অনেকগুলো ক্যানোতে চড়ে এগিয়ে এসে নটিলাসকে ঘিরে ফেলল ওরা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম আমি। হঠাৎ এক ঝাঁক তীর ছুটে এল নটিলাসের দিকে।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেলাম। ক্যাপ্টেনের দরজায় টোকা দিতেই উত্তর এল, 'ভেতরে আসুন।'

ক্যাপ্টেন তখন বীজগণিতের জটিল অঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত।

'অসভ্যেরা চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে, ক্যাপ্টেন।'

'ভেলায় করে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমাদের উচিত ঢাকনি বন্ধ করে দেয়া।' বলে একটা বোতাম টিপে আদেশ দিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন।

'কিন্তু তাতেও তো বিপদ কাটল না। কাল সকালে হাওয়া ঢোকার জন্যে ঢাকনি খুলতেই হবে। তখন?'

'তখন দেখা যাবে।' বলে আমাকে আমাদের দ্বীপ অভিযানের গল্প শোনাতে বললেন।

খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ক্যাপ্টেন বললেন, 'কাল দুপুর ঠিক দুটো চল্লিশে নটিলাস টোরেস প্রণালী ছেড়ে যাবে।'

ঘরে ফিরে এলাম। আমার ঘরে অপেক্ষা করছে কনসীল। ক্যাপ্টেনের সাথে কি কি কথাবার্তা হলো সব তাকে বললাম। অসভ্যদের সম্পর্কে কোনরকম দুশ্চিন্তা করতে বারণ করলাম। 'যাও নিশ্চিন্তে ঘুমাও গে এখন।'

'আমার কোন কাজ নেই তো, স্যার?'

'না।' নেড কোথায়?'

'নেড এখন ক্যাঙারুর গোশতের চপ্ বানাচ্ছে।'

রাতে ভাল ঘুম হলো না। সারা রাত নটিলাসের ছাদে চেঁচামেচি করেছে আর নেচেছে অসভ্যেরা।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম বাইরে যাবার ঢাকনাগুলো খোলা হয়নি তখনও। দুপুর পর্যন্ত ঘরে বসে কাজ করলাম। এর মধ্যে একবারও ক্যাপ্টেনের দেখা পেলাম না।

ঠিক আড়াইটায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর দশ মিনিট পরই নটিলাসের রওনা দেবার কথা। টের পাচ্ছি জাহাজের তলাটা নিচের প্রবাল খণ্ডের সাথে ঘষা খাচ্ছে।

দুটো চল্লিশের একটু আগে ক্যাপ্টেন নিমো এসে হাজির হলেন, 'এবার রওনা হব আমরা। ঢাকনি খোলার আদেশ দিয়ে দিয়েছি আমি।'

'আর ঐ অসভ্যগুলো?'

মুচকি হাসলেন ক্যাপ্টেন।

'আপনার ভয় ঢাকনি খুললেই দলে দলে ভেতরে ঢুকে পড়বে ওরা? কিন্তু, প্রফেসর, তা ওরা পারবে না।'

কিছু না বুঝে অবাক হয়ে তাকালাম ক্যাপ্টেনের দিকে।

'বুঝতে পারলেন না? তাহলে নিজের চোখে দেখবেন, আসুন।'

সিঁড়ির কাছে এগোলাম। নাবিকেরা ঢাকনি খুলতে লেগে গিয়েছে। উপর থেকে অসভ্যদের উল্লাস ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

ঢাকনি খুলে ফেলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক কুড়ি মুখ দেখা দিল সে-পথে। কিন্তু প্রথম অসভ্যটা সিঁড়ির রেলিঙে হাত দিয়েই পেছনে ছিটকে পড়ল। ওপর থেকে কাতর চিৎকার আর দুর্বোধ্য ভাষায় গালাগালি শোনা গেল।

একে একে দশজন ভেতরে আসার চেষ্টা করল। দশজনের ভাগ্যেই ঘটল একই ব্যাপার, রেলিঙে হাত দেয়া মাত্র ছিটকে পড়ছে পিছন দিকে। ব্যাপার দেখে কনসীল খুব মজা পাচ্ছে। নেডল্যাণ্ড হঠাৎ একসময় উত্তেজিত ভাবে উপরে যাবার জন্যে সিঁড়িতে উঠে গেল। কিন্তু রেলিঙটা ছোঁয়া মাত্র সেও ছিটকে পড়ল।

পরিষ্কার বুঝলাম এবার ব্যাপারটা। রেলিঙটা আসলে ধাতু নির্মিত মোটা বৈদ্যুতিক তার। পুরো ভোল্টেজ দেয়া থাকলে ছোঁয়া মাত্রই মৃত্যু ঘটত ওদের। কিন্তু অতটা নিষ্ঠুর হতে পারেননি ক্যাপ্টেন।

ভীষণ ভয় পেয়ে ইতিমধ্যেই অসভ্যেরা পিছু হটতে শুরু করেছে। নেডের শুশ্রূষার দিকে নজর দিলাম আমরা।

হঠাৎ দুলে উঠে চলতে শুরু করল নটিলাস। ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বাজতে কুড়ি। আশ্চর্য ক্যাপ্টেনের হিসেব। ধীরে ধীরে বিপদসঙ্কুল টোরেস প্রণালী ছেড়ে এগিয়ে চললাম আমরা।

পনেরো

পরদিন, ১০ জানুয়ারি। ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে একটানা ছুটে চলল নটিলাস। ১১ জানুয়ারি কেপ ওয়েলস এবং ১২ ও ১৩ জানুয়ারি কার্টিয়ের, হাইবার্ণিয়া, সেরিঙ্গা-পট্টম পেরিয়ে যাবার পর ১৪ জানুয়ারি ডাঙার সব চিহ্ন মুছে গেল। যেদিকে চোখ যায় শুধু পানি আর পানি।

১৬ জানুয়ারি একেবারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল নটিলাস। আমি আর আমার সঙ্গীরা তখন সেলুনে। সেলুনের সেই কাঁচের বেড়াটা খোলা, কিন্তু উজ্জ্বল আলোটা নেভানো। আলো না থাকায় বড় বড় মাছগুলোকে অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখাচ্ছে। একটু পরে আবার জাহাজ চলতে শুরু করতেই আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু একটু ভাল করে দেখেই ভুল বুঝতে পারলাম। আলো জ্বালা হয়নি, অতিক্ষুদ্র এক প্রকার রঙিন জলজ প্রাণীর গা থেকে আসছে ওই আলো। দল বেঁধে ঝাঁকে ঝাঁকে এরকম ভাবে ভেসে বেড়ায় ওরা। দেখে মনে হচ্ছে গলানো সাদা সীসার স্রোতের ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ডুবোজাহাজ।

ওই আলোক তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল নটিলাস। অদ্ভুত শীতল আগুনের আলোয় খেলে বেড়াচ্ছে শুশুক আর প্রায় দশ ফুট লম্বা সোর্ডফিশ।

১৮ জানুয়ারি নটিলাস ১০৫° দ্রাঘিমাংশ ও ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে পৌঁছতেই হঠাৎ আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন হলো। হঠাৎ খেপে গেল সমুদ্র। ঝড়ের সঙ্কেত ফুটে উঠল ব্যারোমিটারে। জাহাজের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। একটু পরে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন নিমো। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট ওঁকে কিছু বলতেই দূরবীনটা নিয়ে দূর সাগরের দিকে চেয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন ক্যাপ্টেন। যেন উত্তেজনার বশে হঠাৎ চেহারা বদলে গেছে তাঁর। ক্যাপ্টেন নিমোর দৃষ্টি অনুসরণ করে দিক চক্রবালের দিকে তাকালাম। কিন্তু অন্তহীন সাগরের বিশাল বিস্তার ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ল না।

এই সময় সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট সাগরের আর একদিকে ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমার কাছে এসব হেঁয়ালির মত মনে হলো। নিচে নেমে টেলিস্কোপটা এনে দেখার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু ভাল করে তাকাবার আগেই কে যেন আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল সেটা।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম। সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন। কিন্তু এ কোন ক্যাপ্টেন নিমো? চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলাম। দপ দপ জ্বলছে চোখের তারা। পাথরের মত শক্ত সমস্ত শরীর। দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তাঁর এ রকম রাগের কারণ বুঝলাম না। আমাকে বললেন তিনি, 'প্রফেসর অ্যারোনাক্স, একটা শর্তের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

'কোন শর্ত, ক্যাপ্টেন?'

'যতক্ষণ না মুক্তি দিই একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে আপনাদের।'

'জাহাজের ক্যাপ্টেন আপনি, আপনার আদেশই শিরোধার্য। তবে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'না,' কঠিন স্বরে বললেন তিনি। 'একটাও না।'

এ আদেশ লঙ্ঘন করা অসম্ভব। কেবিনে ফিরে দুই সঙ্গীকে ক্যাপ্টেনের আদেশের কথা জানালাম। চারজন লোক আমাদের সঙ্গে করে একটা ছোট কামরায় নিয়ে গেল। তেড়ে উঠল নেড। কিন্তু তার আগেই বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। ব্যাপারটা নিয়ে সবাই তখন ভাবছি, এরকম ব্যবহারের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করছি, হঠাৎ নেড বলে উঠল, 'ওই যে, ব্রেকফাস্ট এসে গেছে।'

খাবার টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেয়ে নিলাম। খাওয়া দাওয়ার পর নিভে গেল ঘরের আলো। চারদিক ছেয়ে গেল অন্ধকারে। খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল নেড, একটু পর কনসীলকেও গড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হলাম। কিন্তু অবাক হবার বাকি আছে তখনও। কেন জানি মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগল, দু'চোখের পাতায় নেমে আসছে রাজ্যের ঘুম। নিশ্চয়ই খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘুমিয়ে পড়ার একটু আগে জাহাজের ঢাকনাগুলো বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম। স্থির হয়ে গেল জাহাজ। সাগরের অতল তলে নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে কি নটিলাস? চেতনা লোপ পাচ্ছে আমার। হাজার চেষ্টা করেও খুলে রাখতে পারলাম না চোখের পাতা। ঢলে পড়লাম গভীর ঘুমে।

ষোলো

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম নিজের ঘরে শুয়ে আছি। নেড আর কনসীলকেও বোধহয় ওদের কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগের রাতে কি ঘটেছে কিছুই জানা নেই আমার।

ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে ভাবলাম এখনও কি আমি বন্দী? কিন্তু বাইরে বেরোতে বাধা দিল না কেউ। সোজা প্ল্যাটফর্মে চলে এলাম। নেড আর কনসীল আগেই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে বুঝলাম ওরাও গতরাতের ঘটনা কিছু জানে না। ঢেউয়ের উপর ধীর গতিতে ভেসে যাচ্ছে নটিলাস, কোন পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট একবার প্ল্যাটফর্মে এসে রুটিন নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন। ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা পেলাম না।

দুটোর দিকে যন্ত্রপাতির ঘরে বসে কাজ করছি আমি, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমো। দেখে মনে হলো বেশ ক্লান্ত, চেহারায় অনিদ্রার ছাপ। হাবভাবে অস্থিরতা। হঠাৎ আমার কাছে এগিয়ে এসে তিনি বললেন, 'প্রফেসর, আপনি ডাক্তারি জানেন?'

এরকম প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলাম না। একটু চমকে গিয়ে বললাম, 'এক সময়ে এক হাসপাতালে রেসিডেন্ট সার্জেন হিসেবে কাজ করেছি।'

'তাহলে, দয়া করে আমার একজন নাবিককে একটু দেখবেন?'

'অসুস্থ?'

'হ্যাঁ।'

'চলুন, এখুনি যাচ্ছি।'

নাবিকদের একটা ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন! বছর চল্লিশ বয়সের একটা লোক শুয়ে আছে বিছানায়। দেখে মনে হলো অ্যাংলো স্যাক্সন।

পরীক্ষা করতে শুরু করলাম লোকটাকে। শুধু অসুস্থই হয়নি, আহতও হয়েছে। মাথায় রক্ত মাখা ব্যাণ্ডেজ। ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখলাম সাংঘাতিক ক্ষত মাথায়। কোন অস্ত্রের আঘাতে খুলি ভেঙে মগজ বেরিয়ে পড়েছে।

নাড়ী পরীক্ষা করে দেখলাম গতি অত্যন্ত ক্ষীণ। ইতিমধ্যেই শরীর ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। স্পষ্ট শুনলাম মৃত্যুর পদধ্বনি। ব্যাণ্ডেজটা আবার যথাস্থানে বেঁধে ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালাম।

'কি করে ঘটল এটা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন তিনি, 'অবস্থা কেমন ওর?'

একটু ইতস্তত করতে লাগলাম। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে অভয় দিলেন ক্যাপ্টেন, 'আপনার বক্তব্য নিঃসঙ্কোচে বলতে পারেন। ফরাসী ভাষা বোঝে না ও।'

নিচু গলায় বললাম, 'দু-ঘণ্টার মধ্যেই মারা যাবে।'

'কিছুতেই বাঁচানো যায় না? কিছুতেই না?'

'আমি দুঃখিত।'

একটু যেন কেঁপে উঠলেন ক্যাপ্টেন। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল পানি। অবাক হলাম এরকম কঠিন মানুষের মধ্যে এমন ভাবান্তর দেখে।

'আপনি এখন যেতে পারেন, প্রফেসর। ধন্যবাদ।'

ওই মুমূর্ষু লোকটির কাছে ক্যাপ্টেনকে রেখে কেবিনে ফিরে এলাম। আসন্ন পটভূমিকায় দেখা ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করল আমার মনে। বিছানায় শুয়েও ঘুমাতে পারলাম না। মনের মধ্যে গুনগুন করছে একটা বিষাদের সুর।

পরদিন সকালে প্ল্যাটফর্মে ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা হলো। আমাকে দেখে বললেন, 'আজ একটু সাগরের তলায় যেতে চাই। আপনি যাবেন আমার সাথে?'

'সাগরের তলায়? কি করে?'

'ডুবুরির পোশাক পরে।'

'সে আবার কি জিনিস?'

'আপনি জানেন শ্বাস নেবার বাতাস পেলে মানুষ পানির নিচে চলাফেরা করতে পারে। সাধারণ ডুবুরিরা মাথায় লোহার টুপি পরে নেয়। ওপর থেকে পাম্পের সাহায্যে নলের ভেতর দিয়ে তাদের বাতাস সরবরাহ করা হয়। কিন্তু এভাবে একটা অসুবিধা থেকে যায়। ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে না ডুবুরি। আর যদি লাইন কেটে যায় তাহলে তো নিশ্চিত মৃত্যু। আবার লোহার পাত দিয়ে তৈরি এক রকমের বাক্সে বাতাস ঢুকিয়ে তা ডুবুরিদের পিঠে ব্যাগের মত ঝুলিয়েও দেয়া হয়। দুটো রবারের নল এই বাক্সে লাগিয়ে মুখ এবং নাকের সামনে রাখা একটা মুখোশের মধ্যে ঢোকানো হয়। একটা নল দিয়ে বিশুদ্ধ বাতাস ফুসফুসে ঢোকে, অন্যটা দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমি এই পোশাকের আরও উন্নত সংস্করণ বানিয়ে নিয়েছি। মাথায় একটা তামার গোলক পরিয়ে দিয়ে ডুবুরির বাক্সের

মুখোশসুদ্ধ নল দুটো তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিই আমি।'

'কিন্তু, ক্যাপ্টেন, সাথে যে বাতাস নিয়ে যাওয়া হয় তা দিয়ে তো বেশিক্ষণ পানিতে থাকা যায় না। এ দিয়ে তো এখনও কাজ চালানো যায়নি।'

'তা ঠিক, প্রফেসর। তবে নটিলাসের বাতাস তৈরির পাম্পগুলো নয়-দশ ঘণ্টা পর্যন্ত শ্বাস নেবার মত ঘন বাতাস বাক্সে ভরে দিতে পারে।'

'বুঝলাম। তা সাগরের বেশি গভীরে তো সূর্যের আলো পৌঁছতে পারে না। সেখানে পথ দেখে চলেন কি করে?'

'রূমকর্ফের তৈরি যন্ত্রের সাহায্যে। এর একটা পিঠে বাঁধা থাকে, অন্যটি কোমরের সাথে ঝোলানো। সোডিয়ামের তৈরি তারের সাহায্যে বিশেষ ধরনের লণ্ঠনে বিদ্যুৎ নিয়ে আসা হয়। লণ্ঠনের মধ্যে খুব অল্প পরিমাণ কার্বনিক গ্যাস থাকে। বিদ্যুতের সংস্পর্শেএলেই এই গ্যাস জ্বলে উঠে উজ্জ্বল সাদা শিখার সৃষ্টি করে।'

'আশ্চর্য আপনার বুদ্ধি, ক্যাপ্টেন। ঠিক আছে, যাব। আমার সঙ্গীদের সাথে নিতে পারি?'

'অবশ্যই।'

ক্যাপ্টেন নিমোকে অনুসরণ করে প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে নেড আর কনসীলকে সাথে নিয়ে মেশিন ঘরের কাছে একটা ছোট 'সেল'-এ এসে ঢুকলাম।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দুজন নাবিক এসে এক ধরনের অদ্ভুত পোশাক পরিয়ে দিল আমাদের। পোশাকগুলো ভারি রবারের তৈরি।

ক্যাপ্টেন তাঁর মাথাটা ধাতব শিরস্ত্রাণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। দেখাদেখি আমি, নেড আর কনসীলও তাই করলাম। প্রত্যেকটা শিরস্ত্রাণে তিনটে করে ফুটো, ফুটোগুলো কাঁচ দিয়ে ঢাকা। ওগুলোর ভেতর দিয়ে সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ওটা লাগানোর পর বাতাসের বাক্সটা পিঠে ঝুলিয়ে দেয়া হল। স্বচ্ছন্দে শ্বাস নিতে পারলাম, কোন কষ্ট হলো না। এখন আমরা প্রস্তুত। কিন্তু এত ভারি পোশাক আর সীসার জুতো পরে নড়তেই পারলাম না। হঠাৎ হালকা মনে হলো শরীর। খানিক পরই বুঝলাম ব্যাপারটা। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম সেল-এর দরজাটা বন্ধ হয়ে গেছে। আর গোপন কোন ছিদ্রপথে পানি ঢুকিয়ে ভরে ফেলা হয়েছে সেলটা। বাতাসের চেয়ে পানিতে ওজন অনেক কমে যায়। তাই এত হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে পারছি এখন। এই সময় সেলের নিচের দিকটা দু'দিকে সরে যেতেই আলতো ভাবে নিচের বালিতে পা এসে ঠেকল।

আলো পড়ে চোখের সামনে এক অপূর্ব দৃশ্য ফুটে উঠল। হরেক রঙের আর আকারের জলজ ফুল ফুটে রয়েছে চারপাশে। চলতে শুরু করলাম।

দু'ঘণ্টা পর প্রায় তিনশো গজ ঢালুতে নেমে এলাম। এখানে গাছের ঝোপ নেই। এক সময় দাঁড়িয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেন নিমোর অনুচরেরা তাঁকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরে দাঁড়াল। এতক্ষণে খেয়াল করলাম চারজন লোক আমাদের পিছু পিছু বয়ে এনেছে একটা চুতুষ্কোণ বাক্স।

আমার সাথেই ছিল নেড আর কনসীল। বুঝলাম, আশ্চর্য কিছু ঘটবে এখন।

এলাকাটার জায়গায় জায়গায় উঁচু। ঠিক যেন মানুষের গড়া। একজায়গায় কতগুলো পাথরের ধাপ সিঁড়ির মত করে সাজানো।

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে একজন নাবিক কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল।

এবার সব বুঝলাম। এই জায়গাটা গোরস্থান, আর এই চতুষ্কোণ বাক্সটিতে রয়েছে কালকের আহত লোকটির মৃতদেহ। ক্যাপ্টেন আর তাঁর লোকেরা সাগরের গভীর নির্জনতায় এই গোরস্থানে সমাধিস্থ করতে এসেছে লোকটিকে।

খোঁড়া শেষ হলো কবরটা। আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে ছোট বড় কিছু মাছ। শব বাহকেরা বাক্সতে ভরা মৃতদেহটা আস্তে করে সেই কবরে নামিয়ে রাখল। বুকের ওপর হাত দুটো আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নিমো। লাশটা কবরে শোয়ানো হলে সবাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনায় বসলাম।

আশপাশ থেকে মাটি নিয়ে ভাল করে ভরে দেয়া হলো গর্তটা। সবার শেষে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। তারপর সামুদ্রিক জঙ্গলের তোরণের নিচ দিয়ে ঘন ঝোপ ও প্রবাল স্তূপের পাশ দিয়ে সেই শোকযাত্রা নটিলাসের দিকে ফিরে চলল। বেলা একটায় ফিরে এলাম জাহাজে।

জামা-কাপড় বদলে প্ল্যাটফর্মে এলাম। ক্যাপ্টেন নিমোও সেখানেই। দু'জনে পাশাপাশি বসলাম।

'কাল রাতেই তাহলে মারা গেছে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ। কিন্তু আমরা তাকে ভুলব না। ভুলতে পারব না।' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ক্যাপ্টেন। একটু পর প্রকৃতিস্থ হয়ে বললেন, 'এটাই আমাদের গোরস্থান, প্রফেসর। একশো ফুট পানির নিচে।'

'হাঙ্গর আর অন্যান্য সামুদ্রিক হিংস্র প্রাণীর হাত এড়িয়ে ওখানে শান্তিতেই ঘুমায় আপনার লোকেরা—তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ। হাঙ্গর এবং মানুষ, উভয় জানোয়ারের হাত এড়িয়ে,' গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

সতেরো

সাগর তলের শান্ত নির্জন প্রবাল রাজ্যের সমাধি স্থানটি দেখার পর ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনের আর একটা দিক আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। সমুদ্রে শুধু তিনি জীবনই কাটাচ্ছেন না, শেষ বিশ্রামের জায়গাটিও ঠিক করে রেখেছেন ওখানেই।

আগের রাতে আমাদের বন্দী করে রাখা, ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ানো, আমার হাত থেকে দূরবীন কেড়ে নেয়া আর ওই নাবিকটির শরীরের মারাত্মক জখম দেখে এটুকু বুঝলাম ক্যাপ্টেন নিমো শুধু মানব সমাজকে ছেড়েই আসেননি, এক ভয়ানক প্রতিশোধস্পৃহাও তাঁর শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হচ্ছে।

২৭ জানুয়ারি বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করল নটিলাস। পানিতে বহু মানুষের লাশ ভাসতে দেখলাম। গঙ্গা নদী বেয়ে ভেসে ভেসে লাশগুলো সাগরের পানিতে এসে পড়েছে। কেমন করে মারা গেল লোকগুলো বুঝলাম না। হয়তো কোন মারাত্মক মহামারী লেগেছে এখন গঙ্গার তীরবর্তী গ্রামগুলোতে।

সন্ধ্যা সাতটায় সাগরের পানিকে হঠাৎ দুধের মত সাদা দেখাল। ব্যাপার কি? চাঁদের আলোয় তো এমন হবার কথা নয়। সাগরের তুলনায় কালো দেখাচ্ছে

আকাশটাকে। হঠাৎ বুঝে ফেললাম কারণটা। অ্যামবয়নার তীরেও এ জিনিস দেখেছি আমি। আসলে ওটা ইনফিউসোরিয়া নামে এক পোকার কাণ্ড। উজ্জ্বল এই পোকাগুলোর আকার এক ইঞ্চির হাজার ভাগেরও কম। কয়েক মাইল এলাকা জুড়ে একটার সঙ্গে আর একটা লেগে থাকে এরা। কোন কোন সময় এরা চল্লিশ মাইল পর্যন্ত জায়গা জুড়ে থেকেছে বলে শোনা যায়। মাঝ রাতে সমুদ্র আবার নিজের রঙ ফিরে পেল। তবু বহুক্ষণ পর্যন্ত আমাদের পেছনে দিগন্ত সীমায় আকাশে সাগরের সাদা ঢেউয়ের প্রতিফলন দেখা গেল।

২৪ ফেব্রুয়ারি দুপুরে পশ্চিমে প্রায় আট মাইল দূরে মাটি দেখা গেল। দূর থেকেই চোখে পড়ল পর্বতের শ্রেণী। ক্যাপ্টেন নিমো আর তাঁর সহকারী এই সময় সেখানে এসে দাঁড়ালেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ওই যে দেখছেন, ওটা সিংহল দ্বীপ। মুক্তোর জন্যে বিখ্যাত। মান্নার উপসাগরে যাওয়ার আদেশ দিচ্ছি আমি। রাতেই সেখানে পৌঁছে যাব।'

সহকারীর দিকে ফিরে কিছু বললেন ক্যাপ্টেন। তারপর আবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ভাল কথা, প্রফেসর, হাঙ্গরকে কি ভয় পান আপনি?'

একটু ইতস্তত করে বললাম, 'ওদের সাথে ভাল পরিচয় নেই তো, তাই একটু বুঝে সমঝেই চলি।'

'আমরা কিন্তু ভয় করি না। আপনারও ভয় কেটে যাবে। সাথে করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই যাব, কাজেই ভয়ের কি আছে?' চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনের এই হেঁয়ালির অর্থ ভালমত বুঝলাম না।

একটু পর নেড আর কনসীল এসে হাজির।

'আপনার বন্ধু, ক্যাপ্টেন নিমো এক দারুণ জায়গায় নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাদের,' নেড বলল আমাকে।

'কোথায়?'

'কাল সিংহলে মুক্তো তোলার কেন্দ্রগুলো দেখতে যাব আমরা।'

এবার বুঝলাম হাঙ্গরকে ভয় করি কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কেন ক্যাপ্টেন। এই মুক্তো তোলার কেন্দ্রগুলি এক একটা হাঙ্গরের ডিপো।

'মুক্তো জিনিসটা আসলে কি একটু বুঝিয়ে বলবেন কি, স্যার?' বায়না ধরল কনসীল।

'এক এক জনের কাছে মুক্তো এক এক জিনিস। কবির কাছে মুক্তো হলো সাগরের অশ্রুবিন্দু, পূর্বাঞ্চলের মানুষেরা বলে জমাট শিশিরের ফোঁটা। স্ত্রীলোকেরা একে রত্ন হিসাবে গয়নায় ব্যবহার করে। বৈজ্ঞানিকের কাছে এরা ফসফেট এবং কার্বনেট অফ লাইমের মিশ্রণ মাত্র। আর আমার মত জীববিজ্ঞানীর মতে এটা ঝিনুকের ক্ষরিত রস। যে সমস্ত ঝিনুকের ভেতরের শাঁস নীল, বেগুনি বা সাদা তাদের রস থেকে পাওয়া যায় মুক্তো।'

'এ মুক্তো কি করে সংগ্রহ করা হয়?'

'এমনিতে খোলার ভেতর থেকে জেলেরা তাদের সাঁড়াশি দিয়ে টেনে বার করে। কিন্তু সবচে' সাধারণ উপায় হলো সাগর তীরে সামুদ্রিক উদ্ভিদের তৈরি মাদুরের উপর সেগুলোকে উপুড় করে রাখা। খোলা বাতাসে থাকলে মরে যায় ওরা এবং দিন দশেক পরেই পচন ধরে যায়। এরপর ওগুলোকে ওখান থেকে তুলে সাগরের পানিতে ধুয়ে নিয়ে শুরু হয় বাছাই। প্রথমে উপরের খোসাটিকে তুলে

বস্তায় ভরে চালান দেয়া হয়। তারপর ঝিনুকের ভেতরটা সেদ্ধ করে নিয়ে ছাঁকনিতে ঢেলে একেবারে ছোট্ট মুক্তোটাও বের করে নেয়া হয়।'

'সাগর থেকে ঝিনুক তুলে আনাটা কি বিপজ্জনক?' কনসীল প্রশ্ন করল।

'খুব একটা না। তবে মাঝে মধ্যেই হাঙ্গরের কবলে পড়তে হয় ডুবুরিদের।' নেডের দিকে ফিরে বললাম, 'নেড, হাঙ্গরকে ভয় পাও তুমি?'

'আমি! হারপুন ছোঁড়া যার পেশা সেই নেডল্যাণ্ড ভয় করবে হাঙ্গরকে!' বুকের উপর চাপড় মেরে উত্তর দিল নেড।

'কনসীল, এ ব্যাপারে তোমার মত কি?'

'আমি সোজা কথা ভালবাসি। আমার মনিব যদি তাদের সামনে দাঁড়াতে পারেন তাহলে আমিও পারব।'

আঠারো

পরদিন ভোর চারটায় নটিলাসের পরিচারকের ডাকে ঘুম ভাঙল আমার। উঠে তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় বদলে তৈরি হয়ে সেলুনে হাজির হলাম।

'আপনি তৈরি, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন নিমো।

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।'

'তাহলে আসুন আমার সাথে।'

'ডুবুরির পোশাক পরতে হবে না আমাদের?'

'এখন না। নৌকায় করে জায়গামত পৌছব আগে। আমাদের ডুবুরির পোশাক আর অন্যান্য সরঞ্জাম নৌকায় তোলা হয়েছে।'

ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু প্ল্যাটফর্মে চলে এলাম। নেড আর কনসীল আগেই ওখানে এসে গেছে। নৌকায় বসে আছে নটিলাসের পাঁচজন নাবিক।

তখনও রাতের আঁধার কাটেনি, হালকা মেঘে ঢাকা আকাশের ফাঁক ফোকর দিয়ে উঁকি মারছে দু'একটা তারা। দূর থেকে কালো একটা রেখার মত লাগছে ডাঙাকে।

ক্যাপ্টেন আর আমরা তিনজন নৌকার পেছনে উঠে বসতেই চলতে শুরু করল সেটা। সবাই চুপ। কি যেন ভাবছেন ক্যাপ্টেন নিমো। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ স্পষ্ট দেখা গেল দিগন্তরেখা। তখনও ডাঙা আমাদের থেকে পাঁচ মাইল দূরে। হালকা কুয়াশা জমছে পানির উপরে। ঠিক ছ'টায় সূর্যালোকে আস্তে আস্তে কুয়াশা কেটে যেতেই পরিষ্কার দেখলাম দ্বীপটাকে। ক্রমে দ্বীপের কাছে এগিয়ে গেল নৌকা।

'আমরা এসে গেছি, প্রফেসর,' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ক্যাপ্টেন। 'সামনের ল্যাগুনটা দেখেছেন? ওখানে মুক্তো ব্যাপারীদের নৌকা ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করে থাকে। আর ওই যে, ওদিকের পানিতে সাগর তলায় মুক্তো খুঁজে বেড়ায় ডুবুরিরা। এখন পোশাক পরে নিচে নামব আমরা।'

নাবিকদের সাহায্যে ভারি ডুবুরির পোশাকটা গায়ে চড়ালাম। রুমকর্ফের লাইটটা সাথে নেব কিনা ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন, 'লাগবে না। অত

নিচে নামছি না আমরা। সূর্যের আলোতেই কাজ চলে যাবে। তাছাড়া বৈদ্যুতিক আলো নিয়ে যাবার একটা অসুবিধাও আছে। এখানকার হাঙ্গরগুলো খুব সুবিধের নয়।'

ক্যাপ্টেনের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। নেড আর কনসীলের দিকে চেয়ে দেখলাম ওরা আগেই মাথার হুড পরে ফেলেছে। ক্যাপ্টেনের কথা শুনতে পায়নি।

'অত ভয় পাবার কিছু নেই,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'নিন, এটা রাখুন।' আমার কোমরের বেল্টে একটা ছোরা গুঁজে দিলেন ক্যাপ্টেন।

নেড আর কনসীলও কোমরে ছোরা গুঁজে নিয়েছে। তার উপর নেডের হাতে এক বিশাল হারপুন। মনে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করতে করতে হুডটা পরে ফেললাম মাথায়। একে একে নৌকা থেকে দু'ফুট পানির নিচে মসৃণ বালির উপর নেমে দাঁড়ালাম আমরা। ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিত পেয়ে পানির নিচের ঢাল বেয়ে চলতে শুরু করলাম। ক্রমেই বেড়ে চলল পানির গভীরতা।

পায়ের উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মোনোপটেরা মাছ ভেসে গেল। ডানা থাকে না এসব মাছের। আড়াই ফুট লম্বা সাপ জাভানিজকে দেখেই চিনলাম। চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি আর সুন্দর রঙের সুস্বাদু স্ট্রোমাটিয়ুস জাতের মাছ ছাড়াও দেখলাম অ্যাপসিফোরোইডস গোষ্ঠীর ট্রাঙ্কেবার।

উঠতি সূর্যের আলোয় আস্তে আস্তে আরও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে পানির নিচের রাজ্য। বালির রাজ্য পেরিয়ে নুড়ি পাথরের এলাকায় পৌঁছুলাম। মৃদু উজ্জ্বল প্যানোপায়ার, আকুলাইন আর জুফাইট জাতীয় উদ্ভিদের সমারোহ চারপাশে।

একটু পর চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা গুহামুখ। সামুদ্রিক উদ্ভিদে গুহার আশপাশের পাথরগুলো ঢেকে আছে। আবছা অন্ধকার গুহাটা। সূর্যরশ্মি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি। গুহাটায় প্রথমে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন, আমরা অনুসরণ করলাম তাঁকে। হঠাৎ এ অন্ধকার গুহায় ঢুকলেন কেন ক্যাপ্টেন? একটু পরই বুঝলাম কারণটা। গভীর উতরাই বেয়ে একটা গোলাকার গর্তের মধ্যে এসে নামলাম। থেমে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে একটা জিনিস দেখালেন ক্যাপ্টেন। জিনিসটা একটা প্রকাণ্ড ঝিনুক। আন্দাজ করলাম কম পক্ষে ছ'শ পাউণ্ড ওজন হবে ঝিনুকটার।

এই মস্ত ঝিনুকটার অস্তিত্ব বোধহয় আগে থেকেই জানতেন ক্যাপ্টেন। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে ঝিনুকের ডালা দুটো। কাছে গিয়ে হাতের ছোরাটা ডালা দুটোর মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য হাতে বাইরের ঝিল্লিগুলো তুলে ধরলেন তিনি। আধখোলা ডালাটার ফাঁক দিয়ে মুক্তোটার আকার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নারকেলের সমান বড়,দারুণ স্বচ্ছ আর অপূর্ব উজ্জ্বল মুক্তোটা। হাত বাড়িয়ে তুলে নিতে গেলাম ওটা, কিন্তু মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন ক্যাপ্টেন। ছোরাটা বার করে নিলেন তিনি। সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল ঝিনুকের ডালাদুটো। মুক্তোটা ওই ঝিনুকের ভেতরে থেকে আরও বড় হোক এটাই বোধহয় ক্যাপ্টেনের ইচ্ছা। অনুমান করলাম কম করে হলেও ৫,০০,০০০ পাউণ্ড হবে মুক্তোটার দাম।

মিনিট দশেক পর আর এক জায়গায় এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। ফিরে যাবেন হয়তো এবার তিনি। কিন্তু না, একটা পাথরের ফাটলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ার জন্যে আঙুল তুলে ইশারায় ডান দিকে দেখালেন।

ঠিক পাঁচ গজ দূরে একটা ছায়া দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। চট করে হাঙ্গরের

কথা মনে পড়ে গেল আমার। মেরুদণ্ড বেয়ে শির শির করে নেমে গেল ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত। কিন্তু ভুল করেছিলাম, হাঙ্গর বা সামুদ্রিক জীবের ছায়া সেটা নয়। মানুষ। একজন ভারতীয় জেলে, ঝিনুকের জন্যে পানিতে নেমেছে। তার ঠিক মাথার উপর দেখা যাচ্ছে ওর নৌকাটার ছায়া। নৌকার সাথে দড়ি দিয়ে লোকটার দেহ বাঁধা, দু'পায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে একটা পাথর। নিচে নেমেই যে কটা সম্ভব ঝিনুক কুড়িয়ে সে কোমরের জালের থলিতে ভরল। তারপর উপরে উঠে থলিটি খালি করে আবার নামল।

পাথরের আড়ালে থাকায় আমাদের দেখতে পায়নি সে। এত ঝিনুক তুলল অথচ ওগুলোর কটাতেই বা মুক্তো আছে? তবু পেটের দায়ে জীবন তুচ্ছ করে এ কাজে নেমেছে সে।

একমনে কাজ করে যাচ্ছিল লোকটা, কিন্তু হঠাৎ কেন যেন ভড়কে গেল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ভয়ের কারণটা বুঝলাম। লোকটার ঠিক মাথার ওপর একটা ছায়া। বিশাল এক হাঙ্গর হাঁ করে গিলতে আসছে লোকটাকে। ভয়ে শিউরে উঠলাম।

হাঙ্গরটা তেড়ে যেতেই ডানার আঘাত এড়াবার জন্যে একদিকে শুয়ে পড়ল লোকটা। কিন্তু ডানা এড়ালেও লেজ এড়াতে পারল না। বুকের ওপর লেজের বাড়ি খেয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাঙ্গরটা আবার আক্রমণ করার আগেই ছোরা হাতে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নিমো। এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। নতুন শিকার দেখে লোকটাকে ছেড়ে ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে এল হাঙ্গর। স্থির দাঁড়িয়ে আক্রমণের অপেক্ষায় রইলেন ক্যাপ্টেন। হাঙ্গরটা কাছে এসে যেতেই চট করে একপাশে সরে ছোরা বসিয়ে দিলেন হাঙ্গরের গায়ে। এরপর শুরু হলো এক ভয়ঙ্কর লড়াই।

গা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরুচ্ছে হাঙ্গরটার। লাল হয়ে গেছে সাগরের পানি। হাঙ্গরের একটা ডানা ধরে ঝুলছেন ক্যাপ্টেন নিমো আর বার বার ছোরা বসাচ্ছেন। কিন্তু আসল জায়গায় মারতে পারছেন না কিছুতেই।

মনে মনে ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতে চাইলেও সাহস হলো না আমার। ভয়ে পাথরের মত অনড় দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ মাটিতে পড়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। শরীরের ভার দিয়ে ক্যাপ্টেনকে মাটিতে চেপে ধরল হাঙ্গরটা। হাঙ্গরের ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখতে পেলাম আমি। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে হঠাৎ সামনে ছুটে গেল নেডল্যাণ্ড। হাঙ্গরের একেবারে হৃৎপিণ্ডে বসিয়ে দিল তার বিশাল হারপুন। মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সাগরের পানি তোলপাড় করে তুলল বিশাল জানোয়ারটা।

ক্যাপ্টেনকে উঠতে সাহায্য করল নেড। মাটি থেকে উঠেই জেলেটির কোমরে বাঁধা দড়ি কেটে দিলেন ক্যাপ্টেন। তারপর তাকে দু'হাতে তুলে নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

আমরাও তাঁর সাথে সাথে জেলেটার নৌকায় গিয়ে উঠলাম। লোকটার অবস্থা খারাপই বলতে হবে। বেশিক্ষণ পানিতে ডুবে না থাকলেও হাঙ্গরের লেজের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছে সে। ক্যাপ্টেন আর কনসীলের সেবা যত্নে একটু পরই নড়েচড়ে উঠল লোকটা। ধীরে ধীরে চোখ মেলল সে। চোখের সামনে চারটে তামার শিরস্ত্রাণ দেখতে পেয়ে আরও ভয় পেয়ে গেল। পকেট থেকে ছোট

এক থলে মুক্তো বের করে লোকটার হাতে দিলেন ক্যাপ্টেন। কাঁপা কাঁপা হাতে তা গ্রহণ করল দরিদ্র লোকটি। কথা বলতে পারল না। শুধু দু'চোখের চাউনিতে ক্যাপ্টেনের প্রতি নীরব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেল।

লোকটার নৌকা থেকে আবার আমরা নেমে পড়লাম পানিতে। নিজেদের নৌকায় ফিরে খুলে ফেললাম মাথার হুড। প্রথমেই নেডকে ধন্যবাদ জানালেন ক্যাপ্টেন।

'প্রতিদানটুকু বাকি ছিল, ক্যাপ্টেন,' ধন্যবাদের উত্তরে বলল নেড, 'আপনিও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।'

মৃদু একটা হাসির রেখা খেলে গেল ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে।

নটিলাসে ফেরার পথে হাঙ্গরটার লাশ ভাসতে দেখলাম। পিঠটা ধূসর, পেটটা মাখনের মত সাদা। পৃথিবীর এক ভয়ঙ্করতম হিংস্র জানোয়ার ওটা—শ্বেত হাঙ্গর।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে ফিরে এলাম জাহাজে। মান্নার তীরের ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে ক্যাপ্টেন নিমো সম্পর্কে দুটো জিনিস পরিষ্কার হলো আমার কাছে। এক, তাঁর অসাধারণ সাহস, আর দ্বিতীয়টি, যে মানুষের সমাজকে ঘৃণা করে সাগরের বুকে ঠাঁই নিয়েছেন সেই সমাজের এক ধরনের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ রয়েছে।

এ ব্যাপারে তাঁর সাথে আলোচনা করতে গেলে একটি কথাই বললেন তিনি, 'ওই ভারতীয়টি এক নির্যাতিত দেশের অধিবাসী, চিরকাল নিজেকে ওদেরই একজন বলে ভাবব আমি।'

২৯ জানুয়ারি। ক্রমেই দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল সিংহলের উপকূল। ৫ ফেব্রুয়ারি আমরা এডেনে প্রবেশ করলাম। ৯ ফেব্রুয়ারি লোহিত সাগরের সবচে' শান্ত অংশ দিয়ে যাচ্ছিল নটিলাস। এর পশ্চিমে সৌয়াকিন আর পুবে কুমফিদা উপকূল।

দুপুরে প্ল্যাটফর্মে আমার সাথে মিলিত হলেন ক্যাপ্টেন। আমাকে একটি চুরুট দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগছে লোহিত সাগর? বিশেষ করে এর সামুদ্রিক উদ্ভিদ, জীবজন্তু আর সাগর তীরে প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ?'

'অপূর্ব!' এক কথায় উত্তর দিলাম আমি।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সুয়েজ খাল দিয়ে আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না, প্রফেসর, তবু পরশু ভূমধ্যসাগরে পৌঁছে পোর্ট সৈয়দের দেখা পাবেন।'

'ভূমধ্যসাগর!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'হ্যাঁ, এত অবাক হচ্ছেন কেন?'

'অবাক হব না? আফ্রিকা ঘুরে, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছতে হলে কত জোরে জাহাজ চালানোর দরকার? অত গতি কোথায় পাবে নটিলাস?'

'আফ্রিকা আর উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাব, কে বলল আপনাকে?'

'তাছাড়া পথ কই?'

'সুয়েজের ওপর দিয়ে না গেলেও নিচ দিয়ে তো যাওয়া যাবে।'

'নিচ দিয়ে!' বিস্ময় আরও বেড়ে গেল আমার।

'সুয়েজের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গ আছে একটা। আমি এর নাম দিয়েছি অ্যারাবিয়ান টানেল। এটা দিয়ে পেলুসিয়াম উপসাগরে পড়ব আমরা।'

'সুড়ঙ্গটা খুঁজে পেলেন কি করে?'

'ভাগ্যক্রমেই বলতে পারেন। অবশ্য কিছুটা বুদ্ধিও খরচ করতে হয়েছে। ভাল মত খেয়াল করে দেখেছি লোহিত সাগর আর ভূমধ্যসাগরে অবিকল একই ধরনের মাছ আছে—যা থাকা একেবারেই অস্বাভাবিক। খটকা লাগল মনে—দুটো সাগরের মাঝে কোন সংযোগ নেই তো! বুদ্ধি বার করলাম একটা। সুয়েজে প্রচুর মাছ ধরে তাদের লেজে একটা করে তামার আঙটা পরিয়ে ছেড়ে দিলাম। কয়েক মাস পর সিরিয়ার উপকূলে ওই মাছেরই কয়েকটাকে আবার ধরলাম আমি। এর পর আর সন্দেহ রইল না দুটো সাগরের মাঝে গোপন সংযোগ আছে। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত একদিন পেয়ে গেলাম পথটা।'

১০ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে নেড, কনসীল আর আমি প্ল্যাটফর্মে বসে আছি। পুব উপকূলটা কুয়াশায় ঢাকা। হঠাৎ দূরে কি একটা জিনিসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল নেড, 'ওই যে দেখতে পাচ্ছেন কিছু?'

'না তো!' বললাম আমি, 'আসলে আমার চোখের তেজ তোমার চেয়ে কম, নেড।'

'ভাল করে তাকান। জাহাজের ডান ঘেঁষে ঠিক আলোটার সোজাসুজি—কিছু একটা নড়ছে না?'

'হ্যাঁ, তাই তো,' ভাল করে দেখে বললাম আমি, 'কালো রঙের লম্বা মতন কি যেন...'

'ডুগং।' বলল নেড। উত্তেজনায় চোখ দুটো জ্বলছে ওর। জানোয়ারটাকে হারপুন বিদ্ধ করার জন্যে নিশ্‌পিশ করছে ওর হাত দুটো।

এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে হাজির হলেন সেখানে। ডুগংটাকে দেখে আর নেডের মনোভাব বুঝে বললেন, 'ডুগংটাকে হারপুন বিদ্ধ করতে পারলে বেশ মজা হয়, তাই না, নেড?'

'দেবেন, অনুমতি দেবেন, ক্যাপ্টেন?' প্রবল আগ্রহের সাথে জানতে চাইল নেড।

'বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

সাঁ করে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে গেল নেড। জাহাজ থেকে নৌকো নামানো হলো। সাতজন নাবিক দড়িদড়া আর হারপুন নিয়ে নৌকোয় উঠল। আমি, নেড আর কনসীল নৌকোর পেছনে গিয়ে বসলাম।

ক্যাপ্টেন জাহাজেই থাকছেন। নৌকো ছেড়ে দেয়া হলো। আস্তে আস্তে প্রাণীটার কাছে এগিয়ে গেল নৌকো। হাতে হারপুন নিয়ে নৌকোর সামনের দিকে চলে এল নেড। হারপুনের পেছনে বিশ হাত লম্বা একটা দড়ি বাঁধা। বিদঘুটে দেখতে জানোয়ারটা। লম্বায় প্রায় চব্বিশ ফুট। মুখের দু'পাশে হাতির দাঁতের মত বড় এবং ধারাল দুটো দাঁত।

নৌকো ডুগংটার খুব কাছে, মাত্র ছ'গজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। পাকা হাতে হারপুন বাগিয়ে ধরে জানোয়ারটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল নেডল্যাণ্ড। কিন্তু তার আগেই হিস হিস করে পানিতে ডুবে গেল ডুগং। গালাগাল দিয়ে উঠল নেড।

'একেবারে ফসকায়নি, নেড, ওই দেখ, রক্ত দেখা যাচ্ছে পানিতে।'

নৌকা এগিয়ে নিয়ে পানি থেকে নেডের হারপুনটা তুলে নেয়া হলো।

শ্বাস নেবার জন্যে আবার পানিতে ভেসে উঠল ডুগংটা। কিন্তু এবারও হারপুন

লাগাতে পারল না নেড। মাথায় তখন আগুন জ্বলছে ওর। ঘণ্টাখানেক ধরে আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাল জানোয়ারটা। প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি এমন সময় ঘটল নাটকীয় ঘটনাটা।

হঠাৎ আমাদের দিকে তেড়ে এল ওটা। সদাসতর্ক নেডের দৃষ্টি। সামনে হাত বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওই দেখ।'

ডুগংটা তখন আমাদের নৌকো থেকে মাত্র ফুট বিশেক দূরে। বড় বড় নাকের ছিদ্র দিয়ে বার দুয়েক শ্বাস টেনে আচমকা লাফ দিয়ে এসে পড়ল নৌকোর ওপর। টাল সামলাতে না পেরে কাত হয়ে যাওয়ায় প্রচুর পানি উঠল নৌকোয়। কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে আবার নৌকোটাকে সোজা করে নিল হালের মাঝি। দাঁতে দাঁত চেপে জানোয়ারটাকে তখন কুড়াল দিয়ে কোপাচ্ছে নেড। কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারছে না। ভয়ে কাঁপছি তখন আমি।

শেষ পর্যন্ত এক সময় চরম আঘাত হানতে পারল নেড। জন্তুটাকে নৌকোর সাথে বেঁধে জাহাজে ফিরে এলাম। বহু কষ্টে জাহাজে তোলা হলো ওটাকে। মেপে দেখা হলো প্রায় দশ হাজার পাউন্ড ওজন ওটার।

পরদিন ১১ ফেব্রুয়ারি কিছু সামুদ্রিক সোয়ালো আর হাঁস ধরলাম। বিকেল ছ'টা নাগাদ নটিলাস কখনও পানির নিচ দিয়ে কখনও উপর দিয়ে ভেসে টর উপসাগরে পৌঁছাল। আস্তে আস্তে রাত ঘনাল। দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে পেলিক্যান ও অন্যান্য নিশাচর পাখির ডাক। তার উপর শোনা যাচ্ছে উপকূলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

আটটা থেকে ন'টা পর্যন্ত মাত্র কয়েক হাত পানির নিচ দিয়ে চলল নটিলাস। সুয়েজের কাছাকাছি এসে গেছি তখন। সেলুনের জানালা দিয়ে জাহাজের আলোয় পাথরের সুন্দর স্তরগুলো চোখে পড়ল। ন'টার পর ভেসে উঠল নটিলাস। প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম আমি। সুড়ঙ্গটি দেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠছি ক্রমেই। একটু পর মাইল খানেক দূরে একটা ম্লান আলো দেখতে পেলাম।

'ওটা একটা ভাসমান আলোকস্তম্ভ।' কে যেন পাশ থেকে বলে উঠল।

চমকে ফিরে তাকালাম। পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন।

'ওটা সুয়েজের ভাসমান আলোকস্তম্ভ। একটু পরই সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা।'

'খুব সহজে বোধহয় ঢোকা যায় না সুড়ঙ্গে, তাই না, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ, ঢোকার সময় নিজের হাতে হাল তুলে নিই আমি। নিচে চলুন। পানিতে ডুববে এখন নটিলাস।'

নিচে নেমে এলাম দু'জনে। হুইল হাউসে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনকে দেখে হুইল ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল চালক। শক্ত হাতে হুইল ধরলেন ক্যাপ্টেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'সুড়ঙ্গে ঢুকছি এখন আমরা।'

গতি খুব কমিয়ে দেয়া হলো নটিলাসের। বিশাল এক পাথরের দেয়ালের পাশ দিয়ে চলেছে জাহাজ। প্রায় ঘণ্টা খানেক দেয়ালটার পাশ দিয়ে চলার পর পাথরের রঙ বদলে কালো হয়ে গেল। দু'পাশে সগর্জনে বয়ে চলেছে ফেনায়িত জলরাশি।

সেই সরু সুড়ঙ্গ পথে বৈদ্যুতিক আলোয় প্রতিফলিত আঁকা বাঁকা উজ্জ্বল আলোর রেখা ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। বুক কাঁপছে আমার। যে-কোন সময় পাথরের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হয়ে যেতে পারে নটিলাস।

আরও প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর হুইল থেকে হাত সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ভূমধ্যসাগর!'

প্রবল স্রোত ঠেলে কুড়ি মিনিটেরও কম সময়ে সুয়েজ যোজক পার হয়ে এসেছে নটিলাস।

উনিশ

অপরূপ সুন্দর এই ভূমধ্যসাগর। গভীর নীল পানির রঙ। কমলালেবু আর চিরহরিৎ সুগন্ধি গুল্মের সুরভি ভেসে বেড়ায় এর বাতাসে। চার পাশে পর্বতের দুর্ভেদ্য দেয়াল। ভূমধ্যসাগরের উপরে নির্মল বাতাস, কিন্তু নিচে চাপা আগুন। সারাক্ষণ যেন এখানে সাগর দেবতা নেপচুনের সাথে যুদ্ধ চলছে পাতাল দেবতা প্লুটোর।

পরদিন ১০ ফেব্রুয়ারি সকালে নটিলাস পানির উপর ভেসে উঠতেই চলে এলাম প্ল্যাটফর্মে। দক্ষিণে তিন মাইল দূরে দেখা যাচ্ছে পেলুসিয়ামের অস্পষ্ট রেখা। সাতটার দিকে সেখানে এসে হাজির হলো কনসীল আর নেড।

'এই যে, প্রফেসর,' নেডের বলার ভঙ্গিতে একটু বিদ্রূপের ভাব, 'তা আপনার ভূমধ্যসাগর কই?'

'আমরা এখন তার উপরই ভাসছি, নেড,' বললাম আমি।

'বিশ্বাস করি না আমি।'

'একটু ভাল করে তাকালেই দূরে পোর্ট সৈয়দ দেখতে পাবে তুমি।'

এতক্ষণ খেয়াল করেনি নেড। আমার কথায় চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল। একটু দেখে নিয়েই বলল, 'সত্যিই কেরামতি দেখিয়েছেন তাহলে ক্যাপ্টেন। তা আমাদের ব্যাপারে তাঁর সাথে একটু আলাপ করলে হয় না?'

নেড কি বলতে চাইছে বুঝলাম আমি। এরকম খোলা জায়গায় এসব কথা আলোচনা করা ঠিক হবে না ভেবে ওদের নিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে বসলাম। নেডকে বললাম, 'হ্যাঁ, এইবার বলো কি বলতে চাও তুমি।'

'অতি সোজা কথা। ইউরোপে এসে পড়েছি আমরা। নটিলাস থেকে আমি এখন বিদায় নিতে চাই।'

'আমার কিন্তু নটিলাস ছেড়ে যাবার ইচ্ছা ছিল না। সমুদ্র সম্পর্কে গবেষণার এমন সুযোগ আর কোথাও পাব না।'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমো তো আমাদের যেতে দেবেন না।'

'তাহলে পালাতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে প্রথম চেষ্টাতেই আমাদের সফল হতে হবে। একবার ব্যর্থ হলে ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের ক্ষমা করবেন না।'

'তা সত্যি, কিন্তু ভাল সুযোগ পেলে তা ছাড়া ঠিক হবে কি?'

'ভাল সুযোগ বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'মানে, রাতের বেলা নটিলাস যখন ইউরোপের কোন উপকূলের কাছাকাছি আসবে...'

'সাঁতরে ডাঙায় ওঠার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ, যদি তীর বেশ কাছে হয়, আর পানির উপর ভেসে থাকে নটিলাস।'

'তা না হলে?'

'নৌকাটার সাহায্য নিতে হবে। আপনি জানেন পানিতে ডোবে না ওটা।'

'কিন্তু ইউরোপের তীর ঘেঁষে যাবার সময় মনে হয় আমাদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবেন ক্যাপ্টেন নিমো।'

'সে দেখা যাবে।' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল নেড।

'ঠিক আছে। যেদিন দেখবে সে সুযোগ এসেছে, আমাকে বোলো, সানন্দে তোমার সঙ্গ নেব আমি,' বলে উঠে দাঁড়ালাম।

১৪ ফেব্রুয়ারি প্রাচীন দ্বীপ ক্রীটের দিকে চলল নটিলাস। রেমোরা নামের এক রকমের মাছ দেখলাম এখানে। প্রাচীন লেখকদের মতে এই মাছগুলো নাকি জাহাজের তলায় আটকে থেকে জাহাজের গতি রুদ্ধ করে দিতে পারত। প্রাচীন পুঁথিতে আছে অ্যাকটিয়ামের যুদ্ধের সময় এই খুদে জীবগুলো অ্যান্টনির জাহাজকে আটকে দিয়ে অগাস্টাসকে জিতিয়ে দিয়েছিল। গ্রীকরা এ মাছগুলোকে খুব পবিত্র মনে করে।

পানির মাঝখানে হঠাৎ একজন মানুষকে দেখলাম আমি। কোমরের বেল্টে বাঁধা চামড়ার থলে। সাঁতার কাটতে কাটতে মাঝে মাঝেই শ্বাস নেবার জন্য পানির উপর ভেসে উঠছে সে। উদ্বিগ্ন ভাবে ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললাম, 'একটা লোক বোধহয় জাহাজ থেকে পড়ে গেছে, ওকে বাঁচাতে হবে।'

কোন কথা না বলে গোল জানালাটার কাছে এলেন ক্যাপ্টেন। লোকটিও জানালার কাছে এল। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখলাম আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম তাকে কি একটা ইশারা করলেন ক্যাপ্টেন। লোকটাও হাত তুলে কি বোঝাল। তারপর ওপর দিকে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর দেখা গেল না।

'ভয়ের কিছু নেই,' আমাকে বললেন ক্যাপ্টেন। 'ওর নাম নিকোলাস পেস্কা। বাড়ি ম্যাটাপান অন্তরীপে। ওর মত সাহসী ডুবুরি এ অঞ্চলে কমই আছে। বেশির ভাগ সময়ই পানিতে কাটায়। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে সাঁতরে চলে যায়, এমন কি মাঝে মাঝে ক্রীট পর্যন্ত পাড়ি জমায়।'

ঘরের বাঁ দিকের জানালার কাছে গিয়ে একটা লোহার সিন্দুক খুললেন ক্যাপ্টেন নিমো। সিন্দুকের উপর তামার পাতে নটিলাসের গুপ্ত তথ্য এবং চালানোর কায়দা লেখা রয়েছে দেখলাম। আমার উপস্থিতি ক্যাপ্টেন যেন একেবারেই ভুলে গেছেন। সিন্দুকের ভেতর থেকে একটা মজবুত বাক্স বের করলেন তিনি। বাক্সের ভেতর থেকে বেরুল অনেকগুলো ধাতুর বাট। সোনা। এক এক করে বাটগুলো আরেকটা সিন্দুকের ভেতর সাজিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন। আন্দাজ করলাম চারশো হাজার পাউণ্ড ওজনের সোনা আছে ওখানে, যার বাজার মূল্য হবে প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ড। সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে তার উপর একটা ঠিকানা লিখলেন। ভাষাটা দেখে মনে হলো গ্রীক।

কাজ সেরে একটা বোতাম টিপলেন তিনি। চারজন লোক এসে সিন্দুকটা ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। আমার দিকে ফিরে 'গুডনাইট' জানিয়ে চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। চিন্তাগ্রস্ত ভাবে নিজের ঘরে ফিরে এলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম ওই

www.alorpathsala.org

ডুবুরিটার সাথে এই সিন্দুক ভর্তি সোনার সম্পর্ক কি?

প্ল্যাটফর্মের ওপর কয়েকজোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনে বুঝলাম পানিতে নামানো হচ্ছে নৌকাটা। দু'ঘণ্টা পরে আবার নৌকাটাকে তুলে যথাস্থানে রেখে দেয়ার শব্দ হলো।

তার মানে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের সোনা তাদের গায়ে লেখা ঠিকানায় চালান হয়ে গেল। কিন্তু কোথায়? কোন দেশে? কার কাছে?

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে খুব গরম বোধ হতে লাগল। ম্যানোমিটারে দেখলাম আমরা তখন ষাট ফুট পানির নিচে। ঠিক এ অবস্থায় এরকম গরম তো লাগার কথা নয়। আস্তে আস্তে গরম বাড়তেই থাকল। আগুন লাগল নাকি জাহাজে?

ঘর থেকে বেরোতে যাব, এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো এসে ঢুকলেন। ব্যারোমিটার দেখে বললেন, '১২০ ডিগ্রি।'

'দেখেছি, কিন্তু, ক্যাপ্টেন, এভাবে গরম বাড়লে তো টেকা যাবে না।'

'আমি ইচ্ছে না করলে গরমও বাড়বে না।'

'মানে উত্তাপও কমিয়ে দিতে পারেন আপনি?'

'তা পারি না, কিন্তু আগুনের কুণ্ড থেকে সরে যেতে পারি।'

'গরমটা তাহলে বাইরের?'

'হ্যাঁ, ফুটন্ত পানির ভেতর দিয়ে চলেছি আমরা।'

'কি বলছেন? এও কি সম্ভব?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'বাইরে তাকিয়ে দেখুন।'

গোল জানালাটা খুলে বাইরে তাকালাম। অবাক কাণ্ড! পানির রঙ সাদা, টগবগ করে ফুটছে। গন্ধকের ধোঁয়া উঠছে তা থেকে। জানালার কাঁচে হাত রেখেই সরিয়ে নিলাম। জ্বলন্ত হারিকেনের চিমনির মত গরম কাঁচ।

'কোথায় আমরা?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'সানটোরিন দ্বীপের কাছে। নিয়া ক্যামেন্নি আর পালি ক্যামেন্নির চ্যানেলে এখন নটিলাস। সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরিগুলোর কাণ্ড আপনাকে দেখানোর জন্যেই নটিলাসকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি। ক্যাসিওডোরাস এবং প্লিনির মতে এই ছোট ছোট দ্বীপগুলোর কাছে এই অব্দের উনিশতম বছরে থেইয়া বলে একটা দ্বীপ আবির্ভূত হয়েই আবার অন্তর্হিত হয়। ১৮৬৬ সালের তেসরা ফেব্রুয়ারি নিয়া ক্যামেন্নির কাছে গন্ধকে ভরা গরম বাষ্পের ভেতর থেকে জর্জ আইল্যাণ্ড নামে একটা দ্বীপ জন্ম নেয়। ওই মাসেরই ছ'তারিখে দ্বীপটি অদৃশ্য হয়ে যায়। এর সাত দিন পর তেরোই ফেব্রুয়ারি আফ্রোয়েসা দ্বীপের জন্ম হয়। এ সময় কাছাকাছিই ছিলাম আমি। আফ্রোয়েসা দ্বীপটা দেখতে গোল, ব্যাস তিনশো ফুট, উচ্চতা ত্রিশ ফুট। কালো রঙের লাভা দিয়ে তৈরি দ্বীপটা। দশই মার্চ আরও একটা ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়, এটাও নিয়া ক্যামেন্নির কাছে। শেষ পর্যন্ত তিনটা দ্বীপ একসঙ্গে জুড়ে একটা বড় দ্বীপে পরিণত হয়েছে।'

'সেই চ্যানেল আর দ্বীপের কাছ দিয়েই কি যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ, এই যে।' আমার সামনে ম্যাপ এনে আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ম্যাপের উপর এক নজর চোখ বুলিয়েই জানালার কাছে ফিরে গেলাম। দাঁড়িয়ে আছে এখন নটিলাস, অসহ্য হয়ে উঠেছে গরম। পানি এতক্ষণ

সাদা ছিল, কিন্তু খনিজ পদার্থ মিশে এখন লাল হয়ে উঠেছে। আগুনের লাল শিখার কাছে নটিলাসের বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে। গরমে সেদ্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হলো।

'এই ফুটন্ত পানিতে আর বেশিক্ষণ থাকলে মারা যাব,' ছটফট করতে করতে বললাম ক্যাপ্টেনকে।

ক্যাপ্টেনের আদেশে অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে সরে এল নটিলাস। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা পর নিরাপদ জায়গায় ফিরে এল নটিলাস। সাগরের ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর জুড়িয়ে গেল।

পরদিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি, রোডস আর আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্তী অংশটুকু পেরিয়ে, সেরিগোর কিছু দূর দিয়ে এসে গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে, ম্যাটাপান অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে গেল নটিলাস। মাঠে মারা গেল নেভল্যাণ্ডের পালানোর পরিকল্পনা।

বিশ

আঠারো তারিখ বেলা তিনটায় জিব্রালটার প্রণালীর দুয়ারে এসে পৌঁছুলাম। পলকের জন্যে দেখা গেল হারকিউলিসের সুন্দর মন্দিরটার ধ্বংসাবশেষ। কয়েক মিনিট পরই ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়ে আটলান্টিকে প্রবেশ করলাম আমরা।

২০ ফেব্রুয়ারি ঘুম ভাঙতে বেশ বেলা হলো। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নটিলাস কোনদিকে যাচ্ছে দেখতে গেলাম। কম্পাস আর স্পীডোমিটার দেখে বুঝলাম দক্ষিণে চলেছে নটিলাস—গতি ঘণ্টায় বিশ মাইল।

পনেরো ফুট লম্বা গুকাসের দেখা পেলাম এখানে। এদের ত্রিকোণ দাঁতগুলো ক্ষুরের মত ধারাল। গা এত স্বচ্ছ, পানির রঙের সাথে একেবারে মিশে থাকে। অ্যারিস্টটলের সময় থেকে পরিচিত কাঁটাওয়ালা সী-ড্রাগন আর গজ তিনেক লম্বা, তরোয়ালের মত চোয়ালওয়ালা ম্যাকারাইস মাছ দেখলাম কয়েকটা।

চারটের পর থেকে পাথুরে জমি চোখে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে ব্যাসল্ট, লাভা আর গন্ধকের স্তূপ। আরও দক্ষিণে যাবার পর সামনে বিরাট এক প্রাচীর পথ আটকে দাঁড়াল। বিশাল ওই দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখে মনে হলো আটলান্টিকের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি।

এই সময় জাহাজের সব ক'টা জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো। ঘরে ফিরে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুম ভাঙল পরদিন আটটায়। সেলুনে ঢুকে ম্যানোমিটার দেখে বুঝলাম পানির উপর ভাসছে নটিলাস। প্ল্যাটফর্মে উঠেই থমকে দাঁড়ালাম। দিনের বেলায় এমন ঘুটঘুটে অন্ধকার। নাকি রাতই এখন? ঘড়ি দেখতে ভুল করেছি আমি। কিন্তু একটা তারাও নেই আকাশে।

হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। পেছন থেকে ডাকলেন ক্যাপ্টেন, 'কে ওখানে! প্রফেসর নাকি?'

'এ কোথায় এসে পড়লাম আমরা, ক্যাপ্টেন।'

'মাটির নিচে।'

'মাটির নিচে!' বোকা বনে গেলাম, 'আর নটিলাস পানিতে ভাসছে?'

'হ্যাঁ, ভাসছে।'

'কিচ্ছু বুঝলাম না আমি, ক্যাপ্টেন।'

'আলো জ্বলে উঠলেই দেখতে পাবেন সব।'

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ করেই আলো জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমার। আলোটা চোখে সয়ে যেতেই দেখলাম, একটা পাহাড়ের কাছে জেটির মত জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নটিলাস। প্রায় ছ'মাইল পরিধির হ্রদটার চারদিক উঁচু দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের উপরিভাগটা ক্রমশঃ সামনে ঝুঁকে এসে ধনুকাকৃতি ছাদের মত হয়ে গেছে। ছাদের ঠিক মাঝখানের একটা ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে সামান্য আলো দেখা যাচ্ছে।

'আমরা কোথায়?' আবার জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'একটা মরা আগ্নেয়গিরির মধ্যে। ভূ-পৃষ্ঠের প্রবল আলোড়নে এর ভেতর সাগরের পানি ঢুকে পড়েছে। একটা খাল দিয়ে এখানে ঢুকেছে নটিলাস। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার এমন সুরক্ষিত বন্দর পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি, প্রফেসর?'

'তা নেই,' উপরের দিকে দেখিয়ে বললাম, 'ওই ছিদ্র কিসের?'

'আগ্নেয়গিরির মুখ।'

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, নটিলাসের তো বন্দরের দরকার পড়ে না। তবু আপনি এখানে ঢুকেছেন কেন?'

'নেই, তবে এর সমস্ত শক্তির মূলে বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্যে চাই কতগুলো উপাদান—যেমন, সোডিয়াম। সোডিয়াম আসে কয়লা থেকে। প্রাচীন যুগে সাগরের গ্রাস করা অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিণত হয়েছে কয়লায়, আর এখানে সেরকম একটা কয়লার খনি আছে। যার দাম আমার কাছে অপরিসীম।'

'এ কয়লা তোলেন কি করে?'

'ডুবুরির পোশাক পরে, কুড়াল আর বেলচা দিয়ে পানির নিচ থেকে কয়লা কেটে নিয়ে আসে আমার লোকেরা। সেই কয়লা জ্বালিয়ে তৈরি করি সোডিয়াম। কয়লার ধোঁয়া ওই ছিদ্র পথে বেরিয়ে যেতে দেখে লোকেরা ভাবে মৃত আগ্নেয়গিরি বুঝি আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাই ওরা এর ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।'

'খনিতে কাজ করার দৃশ্যটা দেখার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে আমার।'

'দুঃখিত, প্রফেসর। কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চাই আমি। আমরা মাত্র একদিন থাকব এখানে। তারচে' বরং খাড়াই-এর পথ বেয়ে হ্রদটা ঘুরে আসতে পারেন।'

ক্যাপ্টেনকে ধন্যবাদ দিয়ে তক্ষুণি নেড আর কনসীলকে ডাকতে গেলাম আমি। তাড়াতাড়ি তাদেরকে আসতে বলে প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলাম। এতসব কাণ্ডকারখানা দেখেও অবাক হলো না কনসীল। যেন কোন কিছুতেই অবাক হতে নেই। কিন্তু লাফিয়ে উঠল নেড। পাহাড়ের কোন ফাঁক দিয়ে চম্পট দেয়া যায় কিনা সে পরিকল্পনা শুরু করে দিল। ঠিক দশটায় নটিলাস থেকে নামলাম আমরা।

পর্বতের গা আর হ্রদের মাঝখানে পাঁচশো ফুট চওড়া একটা বালুময় তটভূমি দেখা গেল। ওই তটভূমি ধরে ঘুরে আসা যায় হ্রদটা। পর্বত-প্রাচীরের পাদদেশের পাথুরে জমি আগ্নেয়গিরি থেকে নিক্ষিপ্ত খনিজ পদার্থে আবৃত। নটিলাসের বৈদ্যুতিক আলোর আভায় খনিজ পর্দার্থের স্তূপগুলো বিচিত্র আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে

উঠল। পায়ের তলা থেকে বাতাসে উড়ে গিয়ে ঝিকমিক করছে অভ্রের কণা।

উপরে উঠতে শুরু করলাম আমরা। ক্রমেই পথ আরও খাড়া আর সঙ্কীর্ণ হতে থাকল। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। কনসীলের দক্ষতা আর নেডের শক্তিতে সব বাধা পেরিয়ে চললাম। প্রায় একত্রিশ ফুট ওঠার পর জমির ধরন বদলাতে লাগল। নুড়ি পাথরের বদলে এখানে কালো রঙের ব্যাসল্ট। ব্যাসল্টের চাঁইগুলোর মাঝে মাঝে জমাট বাঁধা লাভাস্রোত, কোন কোনটা গহ্বরকে ঢাকা। উপরের ছিদ্রপথে আসা আলোর ম্লান আভায় পথ দেখে চললাম আমরা। আড়াইশো ফুট ওঠার পর বিশাল এই পাথরের খিলান আমাদের গতি রুদ্ধ করে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে পথটা ঘুরে যেতে হলো। আরও পরে খনিজ পদার্থের পাশে উদ্ভিদের চিহ্ন চোখে পড়ল। এদিক ওদিক কিছু ঝোপঝাড় এমন কি কয়েকটা গাছও বেরিয়েছে পর্বতের গা থেকে। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলের ভারে মাথা নুইয়ে আছে হেলিওট্রোপ্‌সের ঝাড়। এখানে ওখানে পাথরের ফাঁকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ক্রিসেনথিমাম আর ঘৃতকুমারী। লাভাস্রোতের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে একধরনের ছোট্ট বেগুনী ফুল। কয়েকটা তুলে ঘ্রাণ নিয়ে দেখলাম, কোন গন্ধ নেই। অধিকাংশ সামুদ্রিক ফুলেরই ঘ্রাণ থাকে না।

একটু পর কয়েকটা ড্রাগন গাছের গোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। একরকম লাল আঠার মত নির্যাস বের হয় গাছগুলো থেকে। পাথরকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে শক্ত শেকড়।

'আরে, মৌচাক না ওটা?' হঠাৎ বলল নেড।

'মৌচাক!' অবিশ্বাসী কণ্ঠে বললাম আমি।

'হ্যাঁ, চারদিকে মৌমাছি উড়ছে, দেখছেন না?'

ঠিকই বলেছে নেড। ড্রাগন গাছের ডালে এক বিশাল মৌচাক। সাথে সাথে কাজে লেগে গেল নেড। একরাশ শুকনো পাতা জোগাড় করে চকমকি ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া লাগতেই উড়ে পালাল মৌমাছিরা। বেশ কয়েক পাউণ্ড মধু সংগ্রহ করে নিল নেড।

'পাপুয়া দ্বীপ থেকে জোগাড় করা কয়েকটা ব্রেডফ্রুট আছে না জাহাজে? ওই রুটি মধু দিয়ে খেতে যা লাগবে না!'

'এক্কেবারে কেকের মত!' নেডের কথা শেষ হবার আগেই ফোড়ন কাটল কনসীল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, এখন চল তো দেখি।' তাগাদা দিলাম আমি।

বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত, শান্ত ঢেউহীন হ্রদটি ভালই দেখাচ্ছে এখান থেকে।

স্থির দাঁড়িয়ে আছে নটিলাস। প্ল্যাটফর্ম আর পাহাড়ের ওপর কাজে মগ্ন নাবিকদের পাশে ওটাকে কালো, প্রকাণ্ড এক জলদানবের মত দেখাচ্ছে। তখন সর্বোচ্চ শৃঙ্গের প্রথম স্তরটির ওপর দিয়ে হাঁটছি আমরা। এখানে অনেক পাখির বাসা দেখলাম। পাথরের বাসা থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করছে ওরা। সাদা পেটওয়ালা বাজ আর কেস্ট্রেল পাখি দেখেই জিভে পানি এসে গেল নেডের। সাথে বন্দুক আনেনি বলে কপাল চাপড়াতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ঢিল মেরে মেরেই ধরে ফেলল একটা পাখি। আরও আধঘণ্টা পর নিচে নেমে এলাম আমরা। চাটনির জন্যে এক জাতের সামুদ্রিক শৈবাল জোগাড় করল কনসীল। পাথরের আড়াল থেকে হঠাৎ একটা গিরগিটিকে বেরুতে দেখেই তাড়া লাগাল নেড। কিন্তু ধরার

আগেই ছুটে পালাল ওটা। আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নটিলাসে ফিরে এলাম। সেদিন রাতেই গোপন খালটি দিয়ে সেই মৃত আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে এল নটিলাস।

একুশ

২ ফেব্রুয়ারি, সার্গাসো সী বা শৈবাল সাগরের পাশ দিয়ে চলল নটিলাস। এরপর উনিশ দিন অর্থাৎ ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত নটিলাসকে আটলান্টিকেই কাটাতে হলো। প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাড়ে তিনশো মাইল পথ অতিক্রম করছে জাহাজ।

১৪ মার্চ আবার দক্ষিণ মুখো যাত্রা আরম্ভ করল নটিলাস। আমি ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন নিমো কেপ হর্ন ঘুরে অস্ট্রেলিয়ার কাছে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবেন। কিন্তু তা না করে সোজা দক্ষিণেই চলতে লাগল নটিলাস। তবে কি কুমেরুর দিকে যাত্রা করেছেন ক্যাপ্টেন?

এদিকে বাড়ি ফেরার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে নেড। একটা ঘটনায় একেবারে খেপে গেল সে। বেলা এগারোটায় সাগরের উপর দিয়ে ভেসে যেতে একঝাঁক তিমির মাঝে এসে পড়ল নটিলাস। প্ল্যাটফর্মে বসে ছিলাম আমরা, হঠাৎ এই দৃশ্য চোখে পড়ল নেডের।

'তিমি ধরার জাহাজে থাকলে এখন কি মজাটাই না হত! ইশ্! এই লোহার খাঁচায় থেকে আমি কি আর মানুষ আছি নাকি! আরে, আরে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল নেড, 'এত, দশটা না, বিশটা না—এ যে দেখছি তিমির একটা পুরো ঝাঁক। আর চুপ করে বসে তাই দেখতে হচ্ছে আমাকে!'

'কিন্তু, নেড, ওরকম ছটফট না করে ক্যাপ্টেনের কাছে তিমি শিকারের অনুমতি চাইলেই পারো,' বলল কনসীল।

কনসীলের কথা শেষ হওয়ার আগেই ক্যাপ্টেনকে ডাকতে চলে গেল নেড। একটু পরই ক্যাপ্টেনকে সাথে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে হাজির হলো সে।

তিমিগুলো তখনও নটিলাস থেকে মাইলখানেক দূরে। কিছুক্ষণ তাদের গতিবিধি লক্ষ করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'নীল তিমির দল।'

'ওই তিমি শিকারের অনুমতি দেবেন আমাকে, ক্যাপ্টেন?' বলল নেড।

'কেন? নিছক মারার নেশায়? আমাদের তো তিমির তেলের দরকার নেই?'

'কিন্তু তাহলে লোহিত সাগরের ডুগংটাকে মারার অনুমতি দিয়েছিলেন কেন?'

'সেসময় নাবিকদের মাংসের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন তিমি শিকার মানে অকারণ হত্যা। এ রকম শখ পছন্দ নয় আমার। এমনিতেই তেল ব্যবসায়ীরা তিমি মেরে মেরে দুনিয়ার ক্ষতি করছে। বাফিন উপত্যকার সমস্ত তিমিকে ধ্বংস করেছে ওরা। মানুষের অত্যধিক লোভের জন্যে পৃথিবীর বুক থেকে এক অতি প্রয়োজনীয় প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটতে চলেছে।'

এসব কথায় বিশেষ কান দিল না নেড। আমার দিকে পেছন ফিরে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তখন শিস দিচ্ছে সে।

তিমির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন ক্যাপ্টেন, 'জানেন, প্রফেসর, মানুষ ছাড়াও তিমির আর এক ভয়াল শত্রু আছে। দূরে, ওই যে, কালো চলন্ত বিন্দুগুলো দেখছেন?'

'হ্যাঁ।' মাথা নেড়ে জবাব দিলাম আমি।

'ওগুলো ক্যাশালট। তিমি গোত্রেরই, তবে ছোট আকারের এক সাংঘাতিক হিংস্র প্রাণী। এক এক ঝাঁকে এক সঙ্গে দু'তিনশো করে থাকে এরা। মারতেই যদি হয় তবে ওই নিষ্ঠুর প্রাণীগুলোকেই মারা উচিত।'

একথা শুনেই ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল নেড, 'তাহলে ক্যাশালট মারার অনুমতি দিচ্ছেন আমাকে?'

'না, তার জন্যে নটিলাসই যথেষ্ট। নটিলাসের ভয়ানক খড়্গ দিয়ে ক্যাশালটদের ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়া যাবে।'

নিজের হাতে খুন করার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে মন খারাপ হয়ে গেল নেডের।

'হিংস্র প্রাণীদের প্রতি কোন মমতা নেই আমার,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'দেখুন কি করে শায়েস্তা করছি হারামজাদাগুলোকে।'

পঁচাত্তর ফুটের মত লম্বা হয় ক্যাশালটেরা। শুধু মাথাটাই হয় সমস্ত দেহের এক তৃতীয়াংশ। মুখে আট ইঞ্চি লম্বা পঁচিশটা করে বড় বড় দাঁত। তিমিগুলোকে দেখেই ক্যাশালটগুলো তেড়ে গেল ওদের দিকে।

পানির নিচে ডুব দিল নটিলাস। দুই সঙ্গীকে নিয়ে আমি সেলুনের জানালার কাছে গিয়ে বসলাম। হুইল রুমে ঢুকে নিজের হাতে হুইল তুলে নিলেন ক্যাপ্টেন। একটু পরই গতি বেড়ে গেল নটিলাসের। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তিমি আর ক্যাশালটদের মাঝে তুমুল লড়াই বেধে গেছে। নটিলাস গিয়ে পৌঁছতেই এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হলো। খড়্গের আঘাতে ক্যাশালটদের খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগল নটিলাস। জাহাজকে ভেঙে দুমড়ে দেবার চেষ্টা করল ক্যাশালটের দল। জানালা দিয়ে তাদের বিরাট মুখচোখ দেখতে পাচ্ছি আমরা। প্রায় একঘণ্টা যুদ্ধের পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল ওরা। ধীরে ধীরে সমুদ্র শান্ত হলো। উপরে উঠতে শুরু করল নটিলাস। ঢাকনি খুলে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম আমরা। সাগরময় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য খণ্ডিত দেহ। কয়েক মাইল পর্যন্ত রক্তে লাল হয়ে গেছে সাগরের পানি। নেডকে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপ্টেন, 'কি দেখলে, নেড?'

'এক অদ্ভুত দৃশ্য! কিন্তু আমি শিকারি, কসাই নই। এত নিষ্ঠুরতা আমিও সইতে পারি না।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর জীব ওরা। ওদের প্রতি নিষ্ঠুরতায় দোষ নেই।'

'এরচে' আমার হারপুন অনেক ভাল।'

'যে যার নিজের জিনিসটাকেই ভাল মনে করে।'

আমার ভয় হতে লাগল চটে মটে কোন কাণ্ড করে বসতে পারে নেড। কিন্তু নটিলাসের কাছে একটা তিমিকে দেখে তার মন সেদিকে ঘুরে গেল। তিমিটার গায়ে ক্যাশালটের দাঁতের দাগ। মরে কাত হয়ে ভাসছে ওটা। হাঁ হয়ে আছে মুখটা, তার ভেতর পানি ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। নটিলাসকে তিমিটার একেবারে কাছে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। নটিলাস তিমিটার গায়ে ভিড়তেই অবাক হয়ে দেখলাম দু'জন নাবিক তিমিটার বুক থেকে দুধ দুইয়ে নিচ্ছে। প্রায় টন

তিনেক দুধ জোগাড় হয়ে গেল এভাবে। এক কাপ দুধ আমাকে পান করতে দিলেন ক্যাপ্টেন। দুধটা তখনও গরম। খেতে একটু ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগল আমার। কিন্তু ক্যাপ্টেন জোর করতে শুরু করায় পান করে দেখলাম। চমৎকার লাগল। প্রায় গরুর দুধের মতই। সেই দুধ থেকে মাখন ও পনির তৈরি হলো। এর ফলে খাওয়া দাওয়াটা আর একটু জমল আমাদের।

সেদিন থেকে ক্যাপ্টেনের প্রতি নেডের মেজাজ পুরো বিগড়ে গেল। যে-কোন সময় অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে ভেবে নেডের ওপর কড়া নজর রাখতে লাগলাম আমি।

বাইশ

চোদ্দই মার্চ। ৫৫ ডিগ্রী অক্ষাংশের কাছে এখন নটিলাস। বিশ পঁচিশ ফুট লম্বা বরফের চাঁই ভাসতে দেখা গেল আশপাশে। উত্তর মেরু ঘুরে এসেছে নেড, তাই এসব দেখে অবাক হলো না। কিন্তু কনসীল আর আমার কাছে এ দৃশ্য একেবারে নতুন। যতই সামনে এগুতে থাকলাম কুয়াশার মাঝে আরও বড় বরফের চাঁই ঝিকমিক করতে দেখা গেল। কোনটার গায়ে শিরার মত সবুজ দাগ, আবার কোনটা নীলাভ। সূর্যের আলো এদের উপর প্রতিফলিত হয়ে বিচিত্র রঙের সৃষ্টি করেছে।

৬০ ডিগ্রী অক্ষাংশের কাছাকাছি যেতেই পথ বন্ধ করে দাঁড়াল বরফ। অনেক খুঁজে পেতে সঙ্কীর্ণ একটা পথ বের করলেন ক্যাপ্টেন। নটিলাস ভেতরে ঢোকার পরই পেছনে বন্ধ হয়ে গেল পথটা। সেই তুষার স্তূপের ভেতর দিয়েই চলতে থাকল নটিলাস। থার্মোমিটারে দেখলাম শূন্যের দু'তিন ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা।

পনেরোই মার্চ নিউ শেটল্যাণ্ড ও দক্ষিণ অর্কনের কাছে পৌঁছুলাম। ক্যাপ্টেনের কাছে শুনলাম আগে এখানে প্রচুর সীল মাছ পাওয়া যেত, কিন্তু তিমি শিকারির দল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ওদেরকে।

ষোলোই মার্চ। সকাল আটটায় দক্ষিণ মেরুবলয় অতিক্রম করল নটিলাস। বরফের ফাঁকে ফাঁকে কোনরকমে পথ করে এগিয়ে চলেছে ক্যাপ্টেন নিমো। নানা আকৃতির বরফের কোনটাকে মসজিদ, কোনটাকে মিনারের মত মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড শব্দে চারদিকে ভেঙে পড়েছে বিশাল বরফের চাঙড়। সামনের পথ ক্রমেই দুর্গম হয়ে উঠছে। ধাক্কা মেরে মেরে পথ করে নিতে হচ্ছে নটিলাসকে। তাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে ছিটকে উপরে উঠে যাচ্ছে বরফের গুঁড়ো, পরক্ষণেই শিলাবৃষ্টির মতই ঝরে পড়ছে জাহাজের উপর। আরও নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা।

আঠারোই মার্চ একেবারে আটকে গেল জাহাজ। বিশাল সব বরফের পাহাড় গায়ে গা ঠেকিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। দুপুর বেলায় একটুক্ষণের জন্যে সূর্যের দেখা মিলল। সেই সুযোগে আমাদের অবস্থানটা নির্ণয় করে নিলেন ক্যাপ্টেন। আশেপাশে কোথাও পানি চোখে পড়ল না। বরফের পাহাড় কোথাও সূঁচের মত তীক্ষ্ণ হয়ে ২০০ ফুট পর্যন্ত উঠে গেছে। থমথমে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে তুষার রাজ্যে। বরফের চাঙড় ভাঙার অনেক চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু ফল

হলো না।

প্ল্যাটফর্মে ক্যাপ্টেনের দেখা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'অবস্থা কেমন বুঝছেন? বরফের মাঝে তো আটকা পড়ে গেলাম।'

'তার মানে আপনি ভাবছেন নটিলাস আর নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না?'

'তাই তো মনে হয়। সামনে শীত, আরও শক্ত হয়ে জমবে বরফ। এর মধ্যে থেকে বেরুবেন কি করে?'

'ধৈর্য আপনাদের একেবারেই নেই, প্রফেসর। দেখবেন, এই বরফের দুর্গ থেকে ঠিকই বেরিয়ে যাবে নটিলাস।'

'আরও দক্ষিণে যাবেন?'

'একেবারে কুমেরুতে। একমাত্র নটিলাসে করেই তা সম্ভব।'

'কিন্তু উত্তর মেরুর চাইতেও দুর্ভেদ্য এই কুমেরু। এর দুর্গম তুষার স্তূপের মাঝে কোন মানুষ বা জাহাজের পক্ষে যাওয়াটা একেবারেই অসম্ভব।'

'কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে যাচ্ছি আমি।'

'তাহলে চলুন, ক্যাপ্টেন, তুষারের স্তূপ চূর্ণ করে এগিয়ে চলুন। তাতেও না কুলোলে নটিলাসে পাখা লাগিয়ে চলুন উড়েই যাই।'

'তুষার ভেদ করে যাব কে বলল আপনাকে? যাব বরফের নিচ দিয়ে।' আমার বিদ্রূপে কান না দিয়ে শান্ত ভাবে বললেন ক্যাপ্টেন।

'নিচ দিয়ে!' অবাক হবার পালা আমার।

'সাধারণ জাহাজের পক্ষে যা দুঃসাধ্য, ডুবোজাহাজের কাছে তা অতি সহজ।'

'ওহ্‌হো, বুঝেছি,' উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'সাগরের ওপরটা বরফে ঢাকা থাকলেও নিচে পানিই থাকে। যদ্দূর জানি, ভাসমান বরফের চার ভাগের তিন ভাগই থাকে পানির তলায়।'

'ঠিকই জানেন। ওপরে এক ফুট বরফ থাকলে পানির নিচে থাকবে তিন ফুট। আমাদের চারপাশের বরফ চূড়াগুলো তিনশো ফুটের মত উঁচু, কাজেই পানির নিচে আছে ন'শ ফুট।

'আর ন'শ ফুট পানিতে ডুব দেয়া নটিলাসের জন্যে মোটেই কঠিন কিছু না। তবে বাতাসের কিছুটা অসুবিধা হবে।'

'কিন্তু বাতাস ধরে রাখার জন্যে তো বিরাট সব পাত্র আছে নটিলাসে?'

'তা আছে। তবে তার আগে অন্যান্য সম্ভাবনাগুলো ভেবে নিন। ধরুন দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছানোর পর বরফের জন্যে পানির উপরে ভেসে উঠতে পারলাম না।'

'কেন, নটিলাসের মজবুত, ধারাল খড়্গ দিয়ে কেটে পথ করে নেয়া হবে? তাছাড়া উত্তর মেরুতে খোলা সাগর থাকলে কুমেরুতেও থাকবে না কেন?'

'আমারও তাই মনে হয়, প্রফেসর।'

দুর্গম পথে যাত্রার জন্যে তৈরি হলো নটিলাস। পাম্পগুলো চালিয়ে বড় বড় পাত্রে বাতাস ধরে রাখার ব্যবস্থা হলো। বিকেল চারটায় ঢাকনিগুলো বন্ধ করার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। শেষবারের মত বিশাল বরফের স্তূপটার দিকে তাকালাম আমি। ওর নিচ দিয়েই যেতে হবে আমাদের। আরও বেড়ে গেছে ঠাণ্ডা। শূন্যের বারো ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে থার্মোমিটারের পারদ। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে নটিলাসের গায়ে জমে থাকা বরফ ভাঙতে শুরু করল দশজন নাবিক। এরপর নিচে নামা শুরু করল নটিলাস। হিসেব মত নয়শো ফুট নিচেই শেষ হয়ে গেল বরফের

স্তর। কিন্তু আরও নিচে নেমে চলল নটিলাস।

'আমরা কি ওই বরফের স্তূপ পেরোতে পারব, স্যার?' আমাকে জিজ্ঞেস করল কনসীল।

'নিশ্চয়ই!' দৃঢ়ভাবে বললাম আমি। 'ঘণ্টায় ছাব্বিশ মাইল গতিতে সোজা দক্ষিণ মেরুর দিকে ছুটে চলেছে নটিলাস। এই হারে চললে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাব।'

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে পানির নিচের সাগর। কিন্তু কোন প্রকার প্রাণীর দেখা পাওয়া গেল না। রাত দুটোয় নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে সেলুনে এসে ম্যানোমিটার দেখে বুঝলাম আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে নটিলাস। বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল আমার। সত্যিই কি খোলা সমুদ্রে উঠতে পারবে নটিলাস?

হঠাৎ কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল জাহাজ। নিশ্চয়ই বরফের স্তূপ। ম্যানোমিটারে দেখলাম পানির তিন হাজার ফুট নিচে এখন নটিলাস। তার মানে পানির উপরে আছে আরও এক হাজার ফুট বরফ। সেদিন বেশ ক'বার উপরে ওঠার চেষ্টা করল নটিলাস, কিন্তু বরফের স্তূপ ভেদ করতে পারল না। রাতের বেলা অবস্থার পরিবর্তন হলো। চার থেকে পাঁচশো গজ বরফ এখন মাথার উপরে।

সেদিন ভাল ঘুম হলো না। ভোর তিনটেয় ঘুম থেকে উঠে ম্যানোমিটারে দেখলাম মাথার উপর আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট বরফের স্তর। এরপর একবারের জন্যেও ম্যানোমিটার থেকে চোখ সরালাম না। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত তুষারের স্তূপ আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে আসছে। অবশেষে ১৯ মার্চ সকাল ছ'টায় সেলুনে এসে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নিমো। বললেন, 'সাগরের দুয়ার খুলেছে।'

তেইশ

সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে ছুটে গেলাম। সাগরের পানিতে ভাসমান বরফের ছুঁচলো টুকরোর ফাঁকে উঁকি মারছে ছোট ছোট মাছ। আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে পাখির দল। শূন্যের তিন ডিগ্রী উপরে এখন তাপমাত্রা। নিচের বদ্ধ আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে ঝরঝরে হয়ে গেছে শরীর।

'কুমেরুতে কি পৌঁছে গেছি?' ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক বুঝতে পারছি না। দুপুরে বোঝা যাবে।'

'সূর্য দেখা দেবে কি?' কুয়াশায় ঢাকা আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি।

'সামান্য সময়ের জন্যে দেখা দিলেও চলবে।'

দশ মাইল দক্ষিণে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখা গেল। খুব সাবধানে সেদিকে চলতে লাগল নটিলাস। ঘণ্টাখানেক পরে দ্বীপটার কাছে পৌঁছুলাম। এটার পরিধি চার থেকে পাঁচ মাইলের মত হবে।

সকাল দশটায় ওই দ্বীপ থেকে সামান্য দূরে একটা পাথরের ঢিবির কাছে নটিলাসকে দাঁড় করানো হলো। পানিতে নৌকা নামিয়ে ক্যাপ্টেন, কনসীল আর

আমি নৌকায় উঠলাম। সাথে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে কয়েকজন নাবিকও উঠল। নেড এল না আমাদের সঙ্গে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তীরে এসে ঠেকল নৌকা। লাফ মেরে তীরে নামতে যাচ্ছিল কনসীল। কিন্তু আমি তাকে ধরে ফেললাম। ক্যাপ্টেনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'এ মাটিতে প্রথম নামার অধিকার আপনার, ক্যাপ্টেন। সে সম্মান শুধু আপনারই প্রাপ্য।'.

'ধন্যবাদ,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এ দুর্গম রাজ্যে আমাদের আগে কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।' বলেই তীরে নামলেন তিনি। পাথরটার ওপর উঠে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। চেহারায়ও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল অন্তরের উদ্বেলিত আবেগ। পাঁচ মিনিট পর আমাদেরকেও দ্বীপে নামতে বললেন তিনি।

একে একে সবাই নামলাম দ্বীপে। বালি-পাথর মেশানো দ্বীপের মাটির রঙ লাল। দেখেই বোঝা যায় আগ্নেয়গিরির লাভা মেশানো রয়েছে ওতে। দু'এক জায়গা থেকে হালকা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠে যাচ্ছে আকাশে। গন্ধকের গন্ধও পেলাম। কিন্তু চারদিকে যতদূর দেখা যায় আগ্নেয়গিরির চিহ্ন মাত্র নেই। তবে কাছে-পিঠেই যে কোথাও আছে সেটা সুনিশ্চিত। কারণ জেমস্ রস মেরু অঞ্চলে এরেবাস ও টেরর নামে দুটো আগ্নেয়গিরি দেখেছিলেন। এখানে উদ্ভিদের সংখ্যা খুব কম। উপকূলে অসংখ্য ঝিনুক আর শামুক ছড়ানো। তীরের একেবারে কাছে পানির ধারে সী-বাটারফ্লাই-এর খোলাও চোখে পড়ল।

আর আছে কিছু প্রবালের স্তূপ। জেমস্ রসের মতে এ ধরনের প্রবাল স্তূপ মেরু সাগরের হাজার খানেক গজ নিচে থেকে জন্মায়। ছোট ছোট মাছরাঙা আর অজস্র তারামাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। পানি বা মাটির চেয়ে আকাশে প্রাণীর সংখ্যা অনেক বেশি। হাজার হাজার পেঙ্গুইন স্বচ্ছন্দে সাঁতার কাটছে পানিতে। হাবভাবে ভদ্র হলেও গলার স্বরটা এদের খুবই কর্কশ। পায়রার মত বড়, লম্বা লম্বা পা ওয়ালা, সুস্বাদু চিওনিস পাখিও দেখলাম কয়েকটা। বিরাট ডানা মেলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল অ্যালব্যাট্রস।

এগারোটা বেজে গেল, তবু কুয়াশার ঘোমটা সরাল না সূর্য। সূর্যের দেখা না পেলে কোথায় আছি কিছু বোঝা যাবে না। একটা পাথরে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। বেলা গড়িয়ে দুপুর হলো তবু সূর্যের দেখা নেই। আস্তে আস্তে কুয়াশা পরিণত হলো তুষারে।

'আজ আর হলো না। কাল আবার চেষ্টা করে দেখব,' বললেন ক্যাপ্টেন। সেদিনের মত নটিলাসে ফিরে এলাম।

পরদিন তুষারপাত আরও বেড়ে গেল। প্ল্যাটফর্মে থাকা গেল না কিছুতেই। ঘরে বসে ডায়েরী লিখতে লিখতে পেট্রল ও অ্যালব্যাট্রস পাখির ডাক শুনতে লাগলাম। এরই মধ্যে অতি সাবধানে মাইল দশেক দক্ষিণে এগিয়ে গেছে নটিলাস। তার পরদিন ২০ মার্চ তুষারপাত বন্ধ হলো। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে কুয়াশা।

ঘর থেকে বেরোননি তখনও ক্যাপ্টেন। আমি আর কনসীল নৌকায় চড়ে তীরে গিয়ে নামলাম। তখন সকাল আটটা। সূর্য দেখে আমাদের অবস্থান ঠিক করতে আরও চার ঘণ্টা বাকি। মাইল দু'য়েক হাঁটার পর গ্র্যানাইট পাথরে ছাওয়া একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম। উপসাগরকে দক্ষিণা বায়ুর ঝামটা থেকে রক্ষা করে পাহাড়টা। পাহাড়ের গোড়ায় একদল প্রাণীর ডাক শুনতে পেলাম।

'আরে, ষাঁড় না ওগুলো?' কনসীল বলল।

'না, ওগুলোকে বলে সী এলিফ্যান্ট—এক ধরনের বৃহদাকৃতির সীল।' কালো পাথরগুলো বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। বরফ পড়ে পড়ে পিচ্ছিল হয়ে গেছে ওগুলো। বার কয়েক পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম, হাত ধরে আমাকে উঠতে সাহায্য করল কনসীল।

উপরে উঠে দেখলাম ওপরের বরফ ঢাকা সমতলে হাজার হাজার সী এলিফ্যান্ট চরে বেড়াচ্ছে।

সাড়ে এগারোটার দিকে ফেরার পথে দেখলাম একটা ব্যাসাল্ট স্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপ্টেন নিমো। কাছেই কিছু যন্ত্রপাতি। আকাশের উত্তর দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছেন। কোন কথা না বলে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। আস্তে আস্তে দুপুর হলো কিন্তু সূর্য দেখা দিল না। এখন কালকের দিনটাই শুধু ভরসা। কেননা কাল ২১ মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখা পার হয়ে যাবে, সমান হয়ে যাবে দিন রাত্রি। এর পর ছ'মাসের জন্যে আর সূর্যের মুখ দেখা যাবে না। এই ছ'মাসের জন্য এখানে নেমে আসবে ভয়াল মেরুরাত্রি।

নৌকায় ফিরে গেলেন ক্যাপ্টেন। কনসীল আর আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দ্বীপে ঘুরে বেড়ালাম।

পরদিন ২১ মার্চ ভোর পাঁচটায় প্ল্যাটফর্মে এসে ক্যাপ্টেনকে সেখানেই পেলাম।

'আবহাওয়া পরিষ্কার হচ্ছে,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'আজ শেষ বারের মত চেষ্টা করে দেখতে হবে, প্রফেসর।'

ক্রনোমিটার, ব্যারোমিটার ও টেলিস্কোপ নিয়ে দু'জন নাবিকসহ ক্যাপ্টেন আর আমি নৌকায় উঠলাম। ন'টার দিকে তীরে এসে ভিড়ল নৌকা। আস্তে আস্তে আরও পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। দক্ষিণে ভেসে যাচ্ছে মেঘগুলো। মনে হচ্ছে কে যেন পানির ওপর থেকে কুয়াশার পর্দাটাকে টেনে তুলে নিচ্ছে। একটা পাহাড়ের চূড়াকে পর্যবেক্ষণের জায়গা হিসেবে বেছে নিয়ে সেদিকে এগুলেন ক্যাপ্টেন। পাহাড়ের মাঝের ফাটল থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ঝামা আর লাভা পাথর। এসবের ওপর দিয়ে চলতে খুব অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু দৃঢ় পায়ে পাহাড়ে উঠে যেতে থাকলেন ক্যাপ্টেন। চূড়ায় উঠতে দু'ঘণ্টার মত সময় লাগল আমাদের। চূড়ার ওপর থেকে উত্তরে তাকিয়ে দেখলাম বিশাল সাগরের শেষ প্রান্তে নেমে এসেছে আকাশ। পায়ের কাছে পড়ে আছে তুষারের রাজ্য।

কুয়াশা পুরোপুরি সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে নীল আকাশ। চূড়ায় পৌঁছে ব্যারোমিটারের সাহায্যে উচ্চতা মেপে নিলেন ক্যাপ্টেন। পৌনে বারোটায় মাথার ওপর বিরাট ভাঁটার মত দেখা দিল সূর্য, শেষবারের মত এই জনশূন্য স্থলভাগ আর সাগরের ওপর কিরণ ফেলল সেটা। প্রিজম গ্লাসের সাহায্যে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলেন ক্যাপ্টেন। ক্রনোমিটার নিয়ে দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকলাম আমি। ঠিক বারোটায় যদি সূর্যের অর্ধেকটা ডুবে যায় তাহলে বুঝতে হবে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গেছি। ঠিক বারোটায় ক্রনোমিটারের কাঁটার দিকে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, 'অর্ধেকটা সূর্য ডুবে গেছে, ক্যাপ্টেন!'

'তাহলে এই সেই দক্ষিণ মেরু!' স্থির নিষ্কম্প ক্যাপ্টেনের গলা।

অস্ত যাওয়া সূর্য রশ্মির দিকে তাকালাম আমি। দূর দিগন্তে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে

আসছে অন্ধকার। আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে আস্তে করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আমি, ক্যাপ্টেন নিমো, আজ ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ মার্চ দক্ষিণ মেরুর নব্বই ডিগ্রীতে এসে পৌঁছেছি। আজ থেকে এই ভূভাগের মালিক আমি।'

কথাটা বলে 'N' লেখা একটা পতাকা বের করে মাটিতে পুঁতে দিলেন ক্যাপ্টেন।

অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি তখন সমস্ত সাগরকে রক্তিম করে তুলেছে। সেদিকে তাকিয়ে উদাস কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'বিদায় হে সূর্যদেব! বিশ্রামের সময় হয়েছে তোমার। ছ'মাসের জন্যে ভয়াল মেরু রাত্রি নেমে আসুক আমার এ নতুন রাজ্যের ওপর।'

চব্বিশ

পরদিন ২২ মার্চ ভোর ছ'টা। এবার ফেরার পালা। আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমে গিয়ে শূন্যের প্রায় বারো ডিগ্রী নিচে এসে ঠেকল, তার ওপর হাওয়ার ঝাপটায় তীব্র শীত কাঁপন ধরাল শরীরে। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ঝরে পড়ছে পানিতে। সাগরের জায়গায় জায়গায় বরফ জমতে শুরু করল। শীতের ছ'মাসে দক্ষিণ সাগর ঢেকে যায় বরফে।

পানিতে ডুবতে শুরু করল নটিলাস। প্রায় ১০০০ ফুট নেমে, ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে সোজা উত্তরে রওনা দিল। সারাদিনের মধ্যে নটিলাসের যাত্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটল না। পরদিন ভোর তিনটেয় এক জোর ধাক্কায় চমকে উঠে বসলাম বিছানায়। কি হয়েছে বোঝার আগেই আরেক ধাক্কায় ঘরের মাঝখানে ছিটকে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে সেলুনে গিয়ে ঢুকলাম। ঘরের সব আসবাবপত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে। স্থির দাঁড়িয়ে আছে নটিলাস। বাইরে পায়ের শব্দ শুনে মনে করলাম ক্যাপ্টেন আসছেন। কিন্তু না, ঘরে এসে ঢুকল কনসীল আর নেড।

'ব্যাপার কি?' ওদের দেখেই জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনাকেই তো সে কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি আমি!' জবাব দিল কনসীল।

'আমি জানি কি হয়েছে,' চেঁচিয়ে উঠল নেড, 'বেকায়দা রকম ভাবে আটকে গেছে নটিলাস। আর যেভাবে কাত হয়ে আছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এখান থেকে বেরুনো খুব সহজ হবে না। টরেস প্রণালী থেকে বেরিয়েছিল, সে অন্য কথা।'

'কিন্তু নটিলাস কি পানির ওপর উঠতে পেরেছে?' উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

'তা তো জানি না!' বলল কনসীল।

ছুটে ম্যানোমিটারের কাছে গেলাম। ধক করে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। পানির প্রায় চারশো ফুট নিচে এখন নটিলাস।

'এখানে বসে বসে ভাবলে কিছু হবে না। চল ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে দেখি।'

লাইব্রেরিতে ঢুকে কারও দেখা পেলাম না। মাঝের সিঁড়ি, নাবিকের ঘর, কোথাও কেউ নেই। হুইল হাউসে ক্যাপ্টেন আছেন ভেবে সেলুনে ফিরে এলাম আবার। মিনিট কুড়ি পর ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। এই প্রথম দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখলাম তাঁর চেহারায়। কোন কথা না বলে প্রথমে কম্পাস ও পরে ম্যানোমিটারের নির্দেশ দেখে নিয়ে মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন। দক্ষিণ সাগরের একটা জায়গায় আঙুল রেখে কি দেখতে লাগলেন। বিরক্ত করলাম না তাঁকে। মিনিট কয়েক পর কাজ শেষ করে আমার দিকে তাকালেন। টরেস প্রণালীতে আমাকে বলা তাঁর কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম, 'একটা ঘটনা ঘটেছে, না, ক্যাপ্টেন?'

'না, না, এবার আর ঘটনা নয়, দুর্ঘটনাই।'

'মারাত্মক কিছু···'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি, আটকে গেছে নটিলাস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কি করে ঘটল এমনটা?'

'আমাদের কোন দোষ নেই, প্রকৃতির খেয়াল। আমাদের বানানো নিয়মকে তুচ্ছ করতে পারি আমরা, কিন্তু প্রকৃতির সাথে লড়ার সাধ্য নেই মানুষের।'

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ক্যাপ্টেনের এই দার্শনিক উক্তি কেমন উদ্ভট শোনাল।

'কেমন করে ঘটল দুর্ঘটনাটা?'

'বিরাট এক বরফের চাঁই, বলতে গেলে একটা পাহাড়ই উল্টে পড়েছে। পানির নিচের কিছুর সাথে ধাক্কা লাগলে বা অপেক্ষাকৃত গরম পানি থাকলে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে যায় বরফের স্তূপ। এরকম একটা ঘটনাই ঘটেছে এখন। প্রচণ্ড ধাক্কায় নটিলাসকে একপাশে কাত করে ঠেসে ধরেছে বরফের চাঁইটা।'

'নটিলাসে আটকানো সমস্ত পানি ছেড়ে দিয়ে ভারসাম্য ঠিক করে নেয়া যায় না?'

'সে চেষ্টাই হচ্ছে। ম্যানোমিটারে দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে ওপরে উঠছে নটিলাস। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বরফের চাঙড়টাও সাথে সাথে উঠছে। ওটার ঊর্ধ্বগতি বন্ধ করতে না পারলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে না।'

সর্বক্ষণ ম্যানোমিটারের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন। প্রায় দেড়শো ফুট উপরে উঠেছে নটিলাস, কিন্তু বরফের চাঁইটাও সঙ্গে সঙ্গে উঠছে। হঠাৎ কাঁপতে শুরু করল জাহাজ, বোঝা গেল আস্তে আস্তে সোজা হচ্ছে। সেলুনে টাঙানো কাত হয়ে থাকা জিনিসগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল। কি হয় দেখার জন্যে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করে রইলাম আমরা। দশ মিনিট কেটে গেল।

'যাক, এতক্ষণে সোজা হয়েছে নটিলাস।' হাঁপ ছেড়ে বললাম আমি।

'তাই তো দেখছি,' সেলুনের দরজার দিকে যেতে যেতে বললেন ক্যাপ্টেন।

খোলা সাগরে উঠে এসেছে নটিলাস। কিন্তু দশ গজ দূরে দু'পাশে বরফের দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখা গেল। ওপরেও বরফ, সেই বরফের চাঙড় বেঁকে গিয়ে উপরে ছাদের মত হয়ে গেছে। বরফের সুড়ঙ্গে আটকে গেছে নটিলাস। নটিলাসের উজ্জ্বল আলো ওই তুষার প্রাচীরের উপর পড়ে অপরূপ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করল।

'অপূর্ব!' উচ্ছ্বাসের সাথে বলে উঠল কনসীল।

'হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর,' আমি বললাম, 'কি বলো, নেড? এর আগে কোন মানুষকে খোদা এ সৌন্দর্য দেখিয়েছেন কি?'

'তা সুন্দর তো বটেই,' ঝাঁঝিয়ে উঠল নেড, 'কিন্তু কথা হচ্ছে এ সৌন্দর্য দেখে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব তো?'

হঠাৎ কনসীলের চিৎকার শুনে তার দিকে ফিরলাম।

'কি হলো?' ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'চোখ বন্ধ করুন, স্যার, তাকাবেন না ওদিকে!'

আপনা থেকে আমার চোখ পড়ল কনসীলের নির্দেশিত জায়গার দিকে। সাথে সাথেই ধাঁধিয়ে গেল চোখ। পূর্ণবেগে এগিয়ে যাচ্ছে নটিলাস। সেই গতির জন্যে বরফের সাদা রং নটিলাসের আলোয় প্রতিফলিত হয়ে শতগুণ উজ্জ্বল এক অস্বাভাবিক দীপ্তির সৃষ্টি করেছে। এ আলো চোখে সওয়াতে বেশ সময় লাগল।

ভোর পাঁচটায় নটিলাসের খড়্গ আবার কিসে ধাক্কা খেলো। নিশ্চয় কোন বরফের পিণ্ডকে আঘাত করেছে। ভেবেছিলাম ক্যাপ্টেন নিমো গতিপথ বদলে এই বাধা বিপত্তিগুলো ঘুরে যাবেন, নয়তো, সুড়ঙ্গের ভেতরে পথ করে এগুবেন। কিন্তু তা না করে উল্টোদিকে চলতে শুরু করল জাহাজ।

'পিছিয়ে যাচ্ছি নাকি আমরা?' জিজ্ঞেস করল কনসীল।

'হ্যাঁ, সুড়ঙ্গের সামনে হয়তো বেরোবার পথ নেই।'

'কি হবে তাহলে?'

'কি আর হবে! দক্ষিণের খোলা সাগরে ফিরে যেতে হবে আবার।'

বলেই সেলুন থেকে লাইব্রেরিতে চলে এলাম আমি। ওইখানে বসেই কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। বার বার জাহাজের যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলাম আমি। পানির তিনশো গজ নিচে এখন নটিলাস, ঘণ্টায় বিশ মাইল গতিতে দক্ষিণে চলেছে। ওই সঙ্কীর্ণ পথে বিশ মাইল বিপজ্জনক গতিবেগ। কিন্তু আমার মনে হলো তবুও যথেষ্ট জোরে চলছে না নটিলাস। এক একটা মিনিট এক একটা বছরের মত লাগছে। আটটা পঁচিশে দ্বিতীয়বার ধাক্কা খেলো নটিলাস। এবার ধাক্কাটা এল পেছন দিক থেকে। মুখ শুকিয়ে গেল আমার। কনসীল আর নেড আমার পাশেই বসে ছিল। কনসীলের হাতটা আঁকড়ে ধরলাম। ঠিক সে সময় লাইব্রেরিতে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ছুটে গেলাম।

'দক্ষিণের পথও কি বন্ধ?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ, বরফের চাঙড়টা জায়গা বদলে সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে।'

'ভালমতই আটকা পড়েছি তাহলে?'

'হ্যাঁ, ভালমতই।'

www.alorpathsala.org

পঁচিশ

নটিলাসের উপরে, নিচে, চারদিকে এখন বরফের দুর্ভেদ্য দেয়াল। তুষার কারাগারে বন্দী আমরা।

'ভদ্রমহোদয়গণ,' শান্ত কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'দু'ভাবে মরতে পারি এখন আমরা। বরফের চাপে গুঁড়িয়ে, অথবা বাতাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে। খাবার যা মজুত আছে তাতে অবশ্য বেশ কয়েকদিন চলে যাবে।'

'বাতাসের অভাবে মরার আশঙ্কা কমই,' আমি বললাম। 'নটিলাসে সংরক্ষিত অক্সিজেনের পরিমাণ নেহাত কম না।'

'তা ঠিক। কিন্তু তাতে মাত্র দু'দিন চলবে। ইতিমধ্যেই চব্বিশ ঘণ্টা পানির নিচে কাটিয়েছি। বহু আগেই তাজা বাতাস ভরে নেয়া উচিত ছিল, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এখন সর্বমোট আর আটচল্লিশ ঘণ্টা শ্বাস নিতে পারব আমরা।'

'ক্যাপ্টেন, আপনার কি মনে হয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি পাব না আমরা?'

'চেষ্টা তো করবই। প্রয়োজন হলে তুষার প্রাচীরকে ভেদ করে যেতে হবে। তবে কদ্দূর কি হয়···।'

'কোনদিকটা ভেদ করব আমরা?'

'বুঝে দেখতে হবে। সবচে' কম পুরু বরফের স্তর থেকেই কাটার চেষ্টা করা হবে।'

চলে গেলেন ক্যাপ্টেন। এর পরই এক ধরনের হিস্ হিস্ শব্দ শুনে বুঝলাম নটিলাসের ট্যাঙ্কে পানি ভরা হচ্ছে। সাড়ে তিনশো গজ নিচে বরফের স্তরটার উপর গিয়ে থামল নটিলাস।

'পরিস্থিতি মারাত্মক,' নেড আর কনসীলকে বললাম আমি, 'কিন্তু তোমাদের সাহস আর শক্তির ওপর ভরসা আছে আমার।'

'প্রফেসর,' শান্ত কণ্ঠে নেড বলল, 'সবার ভালর জন্যে যে কাজ সেটা করতে কখনও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না আমি।'

'খুব ভাল কথা, নেড।'

'কুড়াল দিয়ে বরফ কাটতে চাইছে ওরা, ওদেরকে হয়তো কিছুটা সাহায্য করতে পারি আমি।'

'চলো তাহলে ক্যাপ্টেনকে বলি কথাটা।'

পোশাক পরে তৈরি হচ্ছিল জাহাজের নাবিকরা। আমি নেডের কথা ক্যাপ্টেনকে বললাম। রাজি হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। নেডও পোশাক পরে নিল। নাবিকেরা তৈরি হবার পর সেলুনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইলাম। একটু পরই দেখলাম বারোজন নাবিক বরফের উপর নামল। সবাইকে ছাড়িয়ে নেডের মাথা দেখা যাচ্ছে। ক্যাপ্টেনও ওদের সাথে আছেন। দেয়াল খোঁড়া শুরু করার আগে একটু মাপজোক করে নিলেন তিনি। মাথার ওপরের বরফস্তরে আঘাত করা সম্ভব না। এক পাশের দেয়াল থেকেই কাটার কাজ আরম্ভ হলো। জাহাজের চারপাশে

একটা পরিখা খোঁড়ার আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। কঠিন বরফের উপর কুড়ালের ঘা পড়তেই চারপাশে ভেসে গেল টুকরো টুকরো বরফ। দু'ঘণ্টা কঠিন পরিশ্রমের পর শ্রান্ত হয়ে পড়ল ওরা। ওদের দলটা তাই বিশ্রামের জন্যে ফিরে এল। নতুন আর এক দলের ওপর কাজের ভার পড়ল। আমি আর কনসীলও এই নতুন দলে যোগ দিলাম। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট রইলেন আমাদের কাজের তদারকিতে। সেই বরফ-ঠাণ্ডা পানিতেও কিছুক্ষণ কাজ করার পরই গা গরম হয়ে উঠল। ঘণ্টা দুয়েক কাজের পর নটিলাসে ফিরে আবহাওয়াতে একটা পরিবর্তন টের পেলাম। এতক্ষণ পিঠে আটকানো রুকুইয়েরল মেশিন থেকে শ্বাসের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাচ্ছিলাম, কিন্তু নটিলাসের বাতাসে অক্সিজেন কমে গিয়ে ক্রমশ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভাগ বাড়ছে। গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় নতুন বাতাস ভরে নেয়া সম্ভব হয়নি।

একটানা বারো ঘণ্টা কাজ করে এক গজ পুরু ছ'শ ঘন গজ বরফ কাটতে পারলাম। এ হিসেবে কাজ করলে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে পাঁচ রাত চার দিন লেগে যাবে। অথচ বাতাস আছে মাত্র দু'দিনের। অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু এ দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করেই যেতে হবে।

রাতের বেলা আরও কিছু বরফের চাঙড় কাটা হলো। কিন্তু সকালে উঠে মন খারাপ হয়ে গেল আমার। শূন্যের সাত ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা। পরিখা থেকে একটু দূরের পানি আস্তে আস্তে জমে যাচ্ছে। এই নতুন আসন্ন বিপদের মোকাবেলা করব কি করে? দ্রুত নটিলাসের চারপাশের পানি জমে বরফ হয়ে যাবে। সেই বরফের চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে নটিলাস। ক্যাপ্টেনকে জানালাম খবরটা।

'জানি আমি,' শান্তকণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন, 'বাড়তি ঝামেলা ওটা। কিন্তু এ থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। পানি সম্পূর্ণ জমে যাবার আগেই এখান থেকে চলে যেতে না পারলে রক্ষে নেই।'

সেদিন অনেকক্ষণ বরফ কাটার কাজে মেতে রইলাম। নটিলাসের চাইতে এখানে বরং ভাল। নিজ নিজ বাক্স থেকে বিশুদ্ধ হাওয়া পাওয়া যাচ্ছে। সন্ধ্যার দিকে আরও গজখানেকের মত গভীর হলো পরিখাটা। নটিলাসে ফিরে শ্বাস নিতে এত কষ্ট লাগল যে মনে হলো দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। আরও বেড়ে গেছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। সংরক্ষিত পাত্র থেকে কিছু বাতাস ছাড়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

পরদিন ২৬ মার্চ আবার বরফ খোঁড়ার কাজ আরম্ভ হলো। তুষার শৈলের নিচের স্তর ও চারপাশের দেয়াল আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে লাগল। স্পষ্ট বোঝা গেল নটিলাস সেখান থেকে বেরুবার আগেই চারপাশ থেকে এসে চেপে ধরবে বরফ। প্রচণ্ড হতাশা পেয়ে বসল আমাকে। হাত থেকে ছুটে গেল কুড়ালটা। এত পরিশ্রম করে লাভ কি? কতক্ষণ আর এভাবে লড়া যাবে? এই সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন। চারপাশে ঘনিয়ে আসা বরফের দিকে আঙুল তুলে দেখালাম। আমাকে নিয়ে নটিলাসে ফিরে এলেন তিনি।

'প্রফেসর,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'এত চেষ্টার পরও বোধহয় বরফের মধ্যে জমেই যেতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু কিছুই কি করার নেই আমাদের?'

'যদি এই প্রচণ্ড চাপ সহ্য করার শক্তি থাকত নটিলাসের!' স্বগতোক্তির মত বললেন ক্যাপ্টেন।

'কি বলতে চাইছেন আপনি? কিসের চাপ?'

'বলতে চাইছি, পানি জমে বরফ হলেই চারপাশের তুষারের স্তূপকে ফাটিয়ে দেবে। এই তুষারের স্তূপই আমাদের কয়েদ করে রেখেছে। জমাট বরফ তাকে ফাটিয়ে দিলে আমাদের পক্ষে ভালই হবে।'

'বুঝলাম। কিন্তু বরফের এই প্রচণ্ড চাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না নটিলাস।'

'সেজন্যেই প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে নিজেদের বাঁচার উপায় বার করতে হবে। বরফ জমা আটকাতেই হবে, যে করেই হোক।'

'সংরক্ষিত বাতাসে আর কতক্ষণ চলবে আমাদের?'

আমার মুখের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'বড়জোর কাল পর্যন্ত।'

টের পেলাম বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে মুখে। দারুণ আতঙ্ক চারদিক থেকে ঘিরে ধরছে আমাকে। অত্যন্ত দুর্বল লাগছে নিজেকে। গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ নিজের মনেই বিড় বিড় করে উঠলেন, 'ফুটন্ত পানি।'

'ফুটন্ত পানি!' অবাক হলাম আমি।

'হ্যাঁ, বদ্ধ জায়গায় আটকে গেছি আমরা। প্রচুর পরিমাণ গরম পানি ঢালতে পারলে তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে বরফ জমা বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তাহলে এখনই কাজ শুরু করা যাক।'

পানি গরম করার বিরাট যন্ত্রগুলোর কাছে আমাকে নিয়ে এলেন ক্যাপ্টেন। বাইরে থেকে পাম্পের সাহায্যে পানি টেনে তুলে গরম করা শুরু হলো। কয়েক মিনিটেই একশো ডিগ্রী গরম হয়ে গেল পানি। পাম্পের সাহায্যেই ওই গরম পানি বাইরে ছাড়া হতে লাগল। অল্প সময়েই এক ডিগ্রী বেড়ে গেল তাপমাত্রা। কিছুক্ষণ পর আরও দু'ডিগ্রী। ক্রমে বাড়ছে আরও।

'কাজ হবে এভাবে,' বললাম আমি।

'আমারও তাই মনে হয়,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'হয়তো বেঁচেও যেতে পারি আমরা।'

সেদিন রাতে তাপমাত্রা বেড়ে শূন্যের এক ডিগ্রী নিচে উঠে এল। তাপমাত্রা শূন্যের দু'ডিগ্রী নিচে থাকলে সাগরের পানি জমে যায়। মনে কিছুটা আশার সঞ্চার হলো।

পরদিন, ২৭ মার্চ আরও ছ'গজ বরফ কাটতে পারা গেল। বাকি আছে মাত্র চার গজের মত। তখনও আটচল্লিশ ঘণ্টার কাজ হাতে আছে। নটিলাসের ভেতরের আবহাওয়ার আরও অবনতি ঘটেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বেলা তিনটায় অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। দূষিত বাতাস গ্রহণের ফলে ব্যথা করতে লাগল ফুসফুস। ধীরে ধীরে চেতনা লোপ পাবার অবস্থা হলো আমার। পাশে বসে আছে কনসীল। বিড় বিড় করে বলছে সে, 'আমি যদি শ্বাস না নিয়ে থাকতে পারতাম, তাহলে সে বাতাসটুকু আপনার কাজে লাগত।'

ওর কথা শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার। অবস্থা ক্রমেই অসহ্য হয়ে আসতে লাগল। প্রাণপণে সেই তুষার প্রাচীরকে ধ্বংস করার চেষ্টা করতে লাগলাম। ওই বরফের বাধাকে সরিয়ে ওপারের মুক্ত হাওয়ায় বেরুতে না পারলে

প্রাণের আশা নেই। ব্যথা হয়ে গেল হাত। জায়গায় জায়গায় হাতের চামড়া ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তবু নিরস্ত হলাম না।

সবাই পালা করে কাজ করছি। একজনের কাজ শেষ হওয়া মাত্রই অন্যজন তার জায়গা দখল করছে।

আর মাত্র দু'গজের মত বরফ কাটা বাকি। এদিকে বাতাস প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সামান্য যা আছে, কঠিন পরিশ্রমরত নাবিকদের জন্যে তা রাখা দরকার। এক বিন্দু নটিলাসে ব্যবহার করা চলবে না। সেদিন কাজের শেষে নটিলাসে ফিরে এসে মনে হলো মারা যাচ্ছি আমি। সে রাতের কথা কোনদিন ভুলব না।

পরদিন বরফ কাটার কাজ খুব একটা এগুচ্ছে না দেখে ক্যাপ্টেন স্থির করলেন নিচের বরফের স্তরকে চূর্ণ করেই এগিয়ে যাবেন। অদ্ভুত লোকটার ধৈর্য। হাজার বিপদের মাঝেও সাহস আর বুদ্ধি হারান না। একটা না একটা নতুন উপায় বের করে ফেলেন।

নটিলাসের ট্যাঙ্ক থেকে সমস্ত পানি ছেড়ে দেয়া হলো। পরিখার উপর নিয়ে আসা হলো জাহাজকে। ট্যাঙ্কগুলো আবার পানিতে ভরে নেয়া হলো। নটিলাসের ওজন দাঁড়াল এখন ১৮০০ টন। নিজেদের কষ্টের কথা ভুলে দুরু দুরু বুকে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। জাহাজের সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। এই শেষ চেষ্টার উপর আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করছে। আগে থেকেই ঝিম ঝিম করছিল মাথা, এখন অত্যন্ত অবসন্ন বোধ করতে লাগলাম। বরফের সাথে সংঘর্ষ হলো জাহাজের। কোটি কোটি কাগজ এক সঙ্গে ছিঁড়ে যাবার মত শব্দ করে ফেটে গেল বরফের স্তর। নিচে ডুব দিল নটিলাস।

'পানিতে নামতে পেরেছি আমরা।' আমার কানে কানে বলল কনসীল।

তার কথায় উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু ওর হাতটা ধরে অত্যন্ত দুর্বলভাবে একটু চাপ দিলাম। বুলেটের মত সামনে এগিয়ে গেল নটিলাস। জোরে পাম্প চালিয়ে ট্যাঙ্কের পানি বের করে দেয়া হতে লাগল। ম্যানোমিটারে দেখা গেল উপর দিকে উঠছে নটিলাস। পূর্ণ গতিতে জাহাজের ইঞ্জিন চলছে। প্রবল গতির ফলে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে সোজা উত্তরে ছুটছে নটিলাস। কিন্তু যদি সাগরের উপরে পৌঁছতে নটিলাসের আর একদিনও লাগে তাহলে বাঁচব না আমি।

লাইব্রেরিতে একটা ডিভানে বসে মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগলাম। সময় সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমার। কতক্ষণ কাটল জানি না, কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছি মৃত্যু ধীরে ধীরে গ্রাস করছে আমাকে। হঠাৎ ফুসফুসে যেন খানিকটা বিশুদ্ধ বাতাস ঢুকল। তবে কি পানিতে ভেসে উঠেছি আমরা? মুক্ত হয়েছি তুষার শৈলের কবল থেকে? না, তা নয়। এ আমার দুই পরম বন্ধু নেড আর কনসীলের আত্মত্যাগের ফল। একটা রুকুইয়েরল বাক্সে তখনও কিছুটা বাতাস ছিল, সেটুকু তারা নিজেরা ব্যবহার না করে আমাকে বাঁচাবার কাজে লাগিয়েছে। ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলাম যন্ত্রটা, কিন্তু আমার হাত চেপে ধরল ওরা। কয়েক মুহূর্ত বেশ সহজভাবে শ্বাস নিতে পারলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম এগারোটা বাজে। কে জানে, আজ বোধহয় ২৮ মার্চ। ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে সাগরকে ছিন্নভিন্ন করে ছুটছে নটিলাস। ম্যানোমিটারে দেখলাম পানির আর মাত্র কুড়ি ফুট নিচে আমরা। আমাদের মাঝে পাতলা একটা বরফের স্তর—এটাকে কি ভেদ করা যাবে না? তির্যকভাবে সামনেটা উঁচু করে প্রবল জোরে বরফের গায়ে ঘা মারল নটিলাস।

একবার মেরেই পিছিয়ে এল, তারপর আবার এগিয়ে গেল। এভাবে বার কয়েক ধাক্কা মারার পর ছিন্ন হয়ে গেল বরফের স্তর। পানির উপর ভেসে উঠল নটিলাস। সাথে সাথে ঢাকনি খুলে দেয়া হলো। সমুদ্রের তাজা বাতাসে নতুন জীবন ফিরে পেলাম আমরা।

ছাব্বিশ

কি করে যে প্ল্যাটফর্মে এলাম বলতে পারব না। যতদূর মনে পড়ে নেড আর কনসীলই বয়ে এনেছে আমাকে। প্রাণ ভরে শ্বাস নিলাম।

প্রচণ্ড জোরে ছুটছে নটিলাস। মেরুবলয় ছাড়িয়ে হর্ন অন্তরীপের দিকে যাচ্ছে এখন সে। ৩১ মার্চ জায়গাটা ছাড়িয়ে গেলাম আমরা।

৩ এপ্রিল পর্যন্ত আমরা প্যাটাগোনিয়ার উপকূল ধরে গেলাম। ৪ এপ্রিল প্যান্টা নদীর মোহনা ছাড়িয়ে, উরুগুয়ে পেরিয়ে আরও ছাপ্পান্ন মাইল এগিয়ে গেল নটিলাস। জাপান সমুদ্র থেকে শুরু করার পর এ পর্যন্ত আমরা প্রায় ষোলো হাজার মাইল পথ ভ্রমণ করেছি।

প্রচণ্ড গতিতে চলতে চলতে ৯ এপ্রিল দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব প্রান্তে শ্যানরোক অন্তরীপের দেখা পেলাম। কিন্তু এ সময় পানির নিচ দিয়ে চলতে লাগল নটিলাস। ১১ এপ্রিল আমাজান নদীর মুখের কাছে আবার ভেসে উঠে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত ভেসেই চলল নটিলাস। দু'দিনেই জাল ফেলে প্রচুর মাছ ধরা হলো। অন্যান্য মাছের সাথে একটা চ্যাপ্টা রে মাছ ধরা পড়ল জালে। লেজটা কেটে ফেলতেই একটা ডিশের মত দেখাল ওটাকে। সাদা পেট, লাল পিঠ আর গায়ে বড় বড় নীল বুটি মাছটার। হঠাৎ একটা মাছ ছটফট করতে করতে জাহাজের একেবারে কিনারায় চলে গেল। লাফ দিয়ে গিয়ে মাছটাকে চেপে ধরল কনসীল। ধরেই চিতপটাং। চেঁচাতে শুরু করল, 'স্যার, শিগগির আসুন, মারা গেলাম আমি।'

তাড়াতাড়ি আমি আর নেড ছুটে গিয়ে তুললাম ওকে। প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে বেচারা। বুঝতেই পারেনি সাঙ্ঘাতিক ক্র্যাম্প মাছকে ধরতে গিয়েছে সে। কিছুক্ষণ পরই অবশ্য সুস্থ হয়ে উঠল কনসীল। সেদিন রাতে নটিলাস আবার গভীর সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলল।

২০ এপ্রিল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি পৌঁছুলাম। পানির নিচের উঁচু খাঁড়িতে গালিচা পেতে দিয়েছে বিচিত্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ। প্রায় এগারোটায় একটা সামুদ্রিক খাঁড়ির মাঝের বড় ফুটোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল কনসীল।

'ওটা বোধহয় পুল্পের গুহা,' বললাম। 'এখন ওই দানবগুলো এসে হাজির হলে মোটেই আশ্চর্য হব না আমি।'

'স্যার, কি ক্যাটল মাছের কথা বলছেন?'

'না, বিশাল পুল্পদের কথা বলছি আমি।'

'ওই রকম কোন প্রাণী আছে বলে বিশ্বাস করি না আমি,' সাফ জানিয়ে দিল নেড।

www.alorpathsala.org

'আমি কিন্তু নিজের চোখে একটা পুল্লকে দাঁড়া দিয়ে জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি পানির তলায়,' বলল কনসীল।

'তুমি দেখেছ?' প্রশ্ন করল নেড।

'হ্যাঁ, আমি দেখেছি।'

'তোমার নিজের চোখে?'

'আমার নিজের চোখে।'

'কোথায়?'

'সেইন্ট মালোতে—'

'বন্দরের নাম নাকি ওটা?'

'না, একটা গির্জা।'

'গির্জা?' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল নেড।

'হ্যাঁ, গির্জায় টাঙানো একটা ছবিতে দেখেছিলাম দৃশ্যটা।'

হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল নেড।

'ঠিকই বলেছে ও,' আমি বললাম, 'ছবিটার কথা আমিও শুনেছি। একটা কিংবদন্তীর চিত্রায়ণ ওটা। কিংবদন্তী বা উপকথার সব কথাই একটু বাড়িয়ে বলা হয়। আর এ ধরনের জলজন্তুর বেলায় তো মানুষের কল্পনা আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে। পুল্প যে কেবল জাহাজই টেনে নিয়ে যায় তা নয়, এমন কথাও শোনা গেছে মাঝে মাঝে এক একটা পুল্প নাকি ছোট ছোট দ্বীপের সমান বড় হয়। পন্টোপিডান নামে এক বিশপের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে পুরো এক সৈন্যবাহিনী নাকি ভুল করে একবার একটা পুল্পের পিঠে নামে। প্রাচীন জীববিদ্যা বিশারদদের মতে পুল্পের শরীর এত বিশাল যে জিব্রাল্টার প্রণালী দিয়ে ঢুকতে গেলে আটকে যাবে ওরা।'

'কতটা সত্যি এসব গল্প?' জিজ্ঞেস করল কনসীল।

'এ ধরনের প্রাণীরা কিছু বড় হয় এটা সত্যি, কিন্তু ওই রকম বিশাল প্রাণীর অস্তিত্ব নিছক কল্পনা। অ্যারিস্টটলের লেখায় ন'ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা ক্যাটল মাছের কথা বলা হয়েছে। আমাদের জেলেরা তো চারফুট লম্বা ক্যাটল মাছ প্রায়ই দেখতে পায়। একজন জীববিজ্ঞানীর মতে ছ'ফুট লম্বা একটা ক্যাটল মাছের দাঁড়াগুলোর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় সাতাশ ফুট। এ থেকেই বোঝা যায় কি ভয়ঙ্কর জীব এরা।'

'এতবড় মাছ কি ধরা পড়েছে?' নেড প্রশ্ন করল।

'না ধরলেও নাবিকরা মাঝেমধ্যে দেখা পায় ওদের। ক্যাপ্টেন পল নামে আমার এক বন্ধুর কাছে শুনেছি ভারত মহাসাগরে তিনি এরকম দানবাকৃতি প্রাণীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। ১৮৬১ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে যাতে লোকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছে এখনও এরকম প্রাণীর অস্তিত্ব আছে।'

'ঘটনাটা কি?'

'আমরা এখন যে এলাকা দিয়ে যাচ্ছি, ১৮৬১ সালে এখানে 'অ্যালেকটর' জাহাজের নাবিকেরা একটা অতিকায় মাছের দেখা পায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন বুগুয়ের জন্তুটিকে হারপুন ও বন্দুক দিয়ে মারার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্দুকের গুলি আর হারপুন তার অস্বাভাবিক নরম, থলথলে শরীরে না বিঁধে পিছলে বেরিয়ে যায়। এভাবে অনেকক্ষণ চেষ্টার পর ব্যর্থ হয়ে জাহাজের নাবিকরা দড়ির ফাঁস বানিয়ে তা দিয়ে তাকে আটকাবার চেষ্টা করতে লাগল। জন্তুটার গায়ে ফাঁস আটকে গেলে

তাকে টেনে তোলার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু প্রাণীটা এত ভারি যে দড়ির টানে তার লেজটাই ছিঁড়ে গেল, আর গভীর পানিতে ডুব দিয়ে পালাল সে।'

'ওরেব্বাবা, সত্যি ঘটনা নাকি এটা?'

'একেবারে সত্যি, নেড। এরপর নাবিকরা ক্যাপ্টেনের নামানুসারে প্রাণীটার নাম দিয়েছিল বুগুয়ের ক্যাটল্ ফিশ্। এরা একজাতের অক্টোপাস।'

'ক'ফুট লম্বা ছিল প্রাণীটা?' প্রশ্ন করল নেড।

জানালার কাছে বসে পানির নিচের অমসৃণ উঁচু নিচু পাহাড়ের চূড়াটার দিকে তাকিয়ে ছিল কনসীল। নেডের কথার সূত্র ধরে বলে উঠল সে, 'লম্বায় গজ ছয়েক ছিল কি ওটা?'

'ঠিক তাই।' বললাম আমি।

'ওটার বোধহয় আটটা দাঁড়া ছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'চোখ দুটো মাথার পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'মুখটা ঠিক তোতাপাখির ঠোঁটের মত?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'বেশ,' আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে শান্ত গলায় বলল সে, 'ওটা যদি বুগুয়ের ক্যাটল ফিশ্ না হয় তাহলে তার আর এক জাতভাই হবে।'

অবাক হয়ে কনসীলের মুখের দিকে চাইলাম। জানালার কাছে ছুটে গেল নেড।

'কি অদ্ভুত প্রাণী!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

আমিও ছুটে গেলাম জানালার কাছে। যা দেখলাম তাতে মনে হলো কিংবদন্তীর সব গল্পই বাজে নয়। প্রকাণ্ড একটা ক্যাটল মাছ, লম্বায় প্রায় আট গজ, তীর বেগে নটিলাসের দিকে ছুটে আসছে। বিরাট সবুজ চোখ দিয়ে সে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মাথায় আটটা দাঁড়া। তোতাপাখির ঠোঁটের মত মুখটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে।

'এটাকেই দেখেছিল অ্যালেকটর জাহাজের লোকেরা?' কনসীল বলল।

'না, না, এটা হতে পারে না,' জবাব দিল নেড। 'ওটার লেজ তো ছিঁড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এটার লেজ ঠিকই আছে।'

মন্তব্য করলাম আমি, 'এ ধরনের প্রাণীর হয়তো আবার লেজ গজাতে পারে। বুগুয়ের মাছটাকে সাত বছর আগে দেখেছিল, এতদিনে তার লেজ গজিয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।'

ইতিমধ্যে আরও গোটা সাতেক ক্যাটল মাছ এসে হাজির হলো সেখানে। নটিলাসের পেছন পেছন মিছিল করে আসতে লাগল ওগুলো। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল জাহাজ, আচমকা ঝাঁকুনি লেগে কেঁপে উঠল জাহাজের লোহার পাত।

'কিসের সাথে আবার ধাক্কা লাগাল নটিলাস?' বললাম আমি।

'কিন্তু পানিতেই তো ভাসছে জাহাজ, কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগার তো কথা নয়।' নেড বলল।

পানিতে ভাসছে নটিলাস, কিন্তু নড়ছে না একচুল। কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন নিমো তার এক সহকারীকে নিয়ে সেলুনে এসে ঢুকলেন। মুখটা গম্ভীর। আমাদের

কিছু না বলে জানালার কাছে গিয়ে প্রাণীগুলোকে দেখে তাঁর সহকারীকে কিছু বললেন। সহকারীটি বেরিয়ে গেল। জানালা বন্ধ করে সেলুনের ছাদের আলো জ্বেলে দেয়া হলো।

'এখানে দেখেছি ক্যাটল মাছের ছড়াছড়ি,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ওদের সাথে এখন একটু লড়াই করতে হবে আমাদের। ওরাই নটিলাসের গতি বন্ধ করে দিয়েছে। যদ্দূর মনে হয়, নটিলাসের ব্লেডে চোয়াল আটকে গেছে কোনটার, তাই নড়তে পারছে না জাহাজ।'

'কি করবেন তাহলে এখন?'

'পানিতে ভেসে উঠে শেষ করতে হবে ওদের।'

'বেশ কঠিন হবে।'

'তা তো হবেই। বুলেটে ওদের কিচ্ছু হয় না।'

'হারপুন দিয়ে কিছু করা যাবে?' নেড বলল, 'অবশ্য আপনি যদি আমার সাহায্য চান।'

'হ্যাঁ, তোমাকে সাহায্য করতে হবে, নেডল্যাণ্ড।'

সবাই ক্যাপ্টেনের পিছু পিছু সিঁড়ি বেয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম। সেখানে এসে দেখলাম জনা দশেক লোক আক্রমণ শুরু করার জন্যে তৈরি। বিশাল এক হারপুন হাতে তুলে নিল নেডল্যাণ্ড।

পানিতে ভেসে উঠেছে নটিলাস। হঠাৎ শাঁ করে একটা শুঁড়ের মত পা গোল জানালা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকল। জাহাজের উপরেও তার অনেকগুলো পা। কুড়ালের এক ঘা মেরে পা-টা কেটে ফেললেন ক্যাপ্টেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দুটো পা এসে একজন নাবিককে জাপটে ধরে শূন্যে তুলে নিল। চিৎকার করে প্ল্যাটফর্ম থেকে ছুটে বেরুলেন ক্যাপ্টেন নিমো, তাঁর পিছু পিছু আমরাও বেরিয়ে এলাম।

হতভাগ্য লোকটা অক্টোপাসের পায়ে আটকে থেকে শূন্যে ঝুলছে আর 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে চিৎকার করছে। লোকটার মুখে ফরাসী ভাষা শুনে চমকে উঠলাম। জাহাজে তাহলে আমার দেশের লোকও আছে! কিন্তু কিছুতেই বাঁচানো গেল না লোকটাকে। ক্যাপ্টেন ওই প্রাণীটার কাছে গিয়ে ওটার আর একটা পা কেটে ফেললেন। নাবিকরাও ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ করে জাহাজের উপরে উঠে আসা পাগুলো কেটে চলল।

জানোয়ারটার আটটা পায়ের সাতটা কেটে ফেলা হয়েছে। বাকি একটা পা দিয়েই সে অসহায় নাবিকটাকে ধরে রেখেছে। সেই পা-টাও কাটার জন্যে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। অমনি একরকম আলকাতরার মত তরল পদার্থ ছড়িয়ে দিল জানোয়ারটা। কয়েক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেলাম না আমরা। আলকাতরার মেঘ পরিষ্কার হলে দেখলাম নাবিকসহ অদৃশ্য হয়েছে অক্টোপাসটা। আরও দশ বারোটা এসে ঘিরে ফেলল নটিলাসকে। সাগরে যেন রক্ত আর কালি এক সাথে গুলে দেয়া হয়েছে। পাগলের মত জানোয়ারগুলোর চোখে হারপুন বিঁধিয়ে চলেছে নেডল্যাণ্ড। হঠাৎ পেছন থেকে একটা পা এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। টানের চোটে চিৎ হয়ে গেল নেড।

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হলো আমার। কুড়াল হাতে ছুটে গেলাম ওর দিকে। কিন্তু আমার আগেই পৌঁছে গেলেন ক্যাপ্টেন। কুড়ালের উল্টা পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারলেন অক্টোপাসটার মুখে। তারপর এক কোপে কেটে ফেললেন

নেডকে জড়িয়ে ধরা পা-টা।

একলাফে উঠে দাঁড়াল নেডল্যাণ্ড। অক্টোপাসটার হৃৎপিণ্ডে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল তার হারপুন।

'একদিন তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে, নেড,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'আজ আমি তার প্রতিদান দিলাম।'

কিছু বলল না নেড, মাথা নুইয়ে শুধু সম্মান জানাল ক্যাপ্টেনকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক জীবন মরণ লড়াই চলার পর হাল ছেড়ে দিয়ে পানির তলায় পালিয়ে গেল আহত প্রাণীগুলো। ক্লান্ত, রক্তাক্ত শরীর নিয়ে নীরবে সাগরের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। দু'চোখে অশ্রুধারা। তাঁর এক প্রিয় সাথীকে আজ গ্রাস করেছে ওই সমুদ্র।

সাতাশ

২০ এপ্রিলের সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য কেউ ভুলতে পারলাম না। আমরা নটিলাসে আসার পর এই নিয়ে তাঁর দু'জন সঙ্গীকে হারালেন ক্যাপ্টেন। মৃত্যুভয়ে ভীত সেই লোকটার চিৎকার এখনও যেন কানে বাজছে আমার। এতদিন আমার সামনে দিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছে ওই লোকটা অথচ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি সে আমারই স্বদেশী।

ক্যাপ্টেন নিমো সেই যে তাঁর ঘরে ঢুকলেন আর তাঁর দেখা পেলাম না। বার বার দুর্ঘটনার জায়গায় ফিরে আসতে লাগল নটিলাস। কোনমতেই লোকটাকে ভুলতে পারছেন না ক্যাপ্টেন। দশদিন এভাবে কাটার পর উত্তর দিকে চলতে শুরু করল নটিলাস। এক সময় গালফ স্ট্রীমে এসে পড়ল জাহাজ। সেদিন রাতে গালফের পানিতে জমাট বাঁধা ফসফরাসের অত্যুজ্জ্বল আলো দেখতে পেলাম। এ আলো দেখার ইচ্ছে ছিল আমার বহু দিনের।

৮ মে হাটেরাস অন্তরীপের পাশ দিয়ে চলল জাহাজ। গালফের প্রস্থ এখানে পঁচাত্তর মাইল, গভীরতা দু'শ দশ গজ। এখনও তেমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলছে জাহাজ। মনে হচ্ছে একে চালাবার যেন কেউ নেই। এরকম অবস্থায় জাহাজ থেকে পালানোর সম্ভাবনাটা মনে পড়ল আমার। নিউ ইয়র্ক-টু-বোস্টন যাতায়াতকারী অসংখ্য স্টীমারকে এ পথে চলাচল করতে দেখলাম। পালাবার সময় এদের সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটা কারণে সাহস পাচ্ছিলাম না। আবহাওয়া তখন খুবই খারাপ। এরকম খ্যাপা সাগরে ছোট্ট একটা নৌকায় করে পালানো মৃত্যুরই সামিল।

অধৈর্য হয়ে উঠল নেড। কি করে পালানো যায় এটাই শুধু তার সারাক্ষণের চিন্তা। একদিন আমার কাছে এসে বলল সে, 'প্রফেসর, ক্যাপ্টেন নিমো বোধহয় এবার উত্তর মেরুর দিকে রওনা দেবেন। দক্ষিণ মেরুতে গিয়েই আশ মিটে গেছে আমার, উত্তরে আর যেতে চাই না।'

'কিন্তু উপায় কি, নেড, এখান থেকে পালানো অসম্ভব।'

'চলুন ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলি। নটিলাস যখন আপনার দেশের সাগরে ছিল

আপনি চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু এখন আমার দেশের কাছ দিয়ে যাবার সময় সুযোগ ছাড়ব না আমি। যখনই ভাবি অল্পদিন পরই নোভাস্কোশিয়ায় পৌঁছবে নটিলাস, আর নোভাস্কোশিয়ার কাছে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের এক উপসাগরে পড়া সেন্ট লরেন্স নদীর তীরে কুইবেক শহরে আমার বাড়ি, তখন মাথা গরম হয়ে যায় আমার। আপনাকে বলে রাখছি আমি বরং সাগরে ঝাঁপ দেব, তবু আর এ লোহার দুর্গে থাকব না।'

আমার অবস্থাও ক্রমে নেডের মতই হয়ে আসছিল। প্রায় সাত মাস হয়ে গেছে দেশের খবর জানি না। ক্যাপ্টেন নিমোর এই আকস্মিক পরিবর্তন, মৌন ভাব, সবকিছুই আমার চিন্তাধারাকে অন্য পথে সরিয়ে নিল।

'আপনার মত তাহলে কি, প্রফেসর?' আমি নীরব থাকায় আবার প্রশ্ন করল নেড।

'তার মানে তুমি আমাকে ক্যাপ্টেনের সাথে এ সম্পর্কে কথা বলতে বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আগেই তো তিনি তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন, এরপরও তাঁর কাছে এ নিয়ে কথা বলতে বলছ?'

'হ্যাঁ, দরকার হলে আমার কথাই বলবেন তাঁকে।'

'কিন্তু আজকাল তো তাঁর সাথে দেখা হয় না আমার। আমাকেও যেন এড়িয়ে চলেন তিনি।'

'সেই জন্যেই তো আরও দেখা করা দরকার।'

ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দরজায় টোকা দিয়ে সাড়া পেলাম না। দ্বিতীয়বার টোকা দিয়েও সাড়া না পেয়ে হাতল ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সাথে কাজ করছিলেন ক্যাপ্টেন, আমার টোকা শুনতে পাননি। তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ মাথা তুলে আমায় দেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

'আপনার সাথে কিছু কথা আছে, ক্যাপ্টেন।'

'কিন্তু এখন ব্যস্ত আমি, কাজ করছি।'

তাঁর এ অভ্যর্থনা মোটেই প্রীতিকর ঠেকল না, কিন্তু আজ একটা বোঝাপড়া করার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছি আমি।

'ক্যাপ্টেন, আপনার সাথে এমন একটা বিষয়ে কথা বলতে এসেছি যে আর দেরি করা চলে না।'

'কি? এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে?' বলে উত্তরের আশা না করেই টেবিলে রাখা একটা পাণ্ডুলিপি দেখিয়ে বললেন, 'প্রফেসর, এটা ভিন্ন ভাষায় লেখা পাণ্ডুলিপি। এতে আমার সাগর চর্চা, জীবনের ইতিহাস, নটিলাসের সব তথ্য লেখা আছে। পানিতে ভেসে থাকবে এমন একটা বাক্সে এটাকে ভরে রাখব আমি। আমি চাই আমার মৃত্যুর পরও যেন এই ইতিহাস বেঁচে থাকে। তাই ঠিক করেছি নটিলাসের শেষ জীবিত লোকটি বাক্সটা পানিতে ফেলে দিয়ে যাবে। সাগরের ঢেউয়ে এটা ভেসে যাবে যেখানে খুশি।'

সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার, একদিন তাহলে ক্যাপ্টেনের জীবনের ইতিহাসও উদঘাটিত হবে।

'ক্যাপ্টেন,' বলতে লাগলাম আমি, 'আপনার এই পরিকল্পনাটি চমৎকার

লাগছে আমার কাছে। আপনার এতদিনের গবেষণার ফল পৃথিবীর লোকের জানা দরকার। কিন্তু আপনি যেভাবে চাইছেন সেটা কি ঠিক হবে? সাগরের ঢেউয়ে বাক্সটা কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে? তারচে অন্য কোন উপায় ভাবা যায় না? ধরুন আপনার কোন একজন—'

'না, প্রফেসর—' আমার কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিলেন তিনি।

'কিন্তু আমি বা আমার সঙ্গীরা এ পাণ্ডুলিপি বয়ে নিতে রাজি আছি যদি আমাদের মুক্তি দেন—'

'মুক্তি!' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন।

'হ্যাঁ, মুক্তি। এ বিষয়েই আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি আমি। সাত মাসের মত এ জাহাজে আছি আমরা। নিজের আর আমার সঙ্গীদের তরফ থেকে জিজ্ঞেস করছি, চিরকাল আমাদের আটকে রাখাই কি আপনার ইচ্ছা?'

'প্রফেসর, এ প্রশ্নের উত্তর সাত মাস আগেই আপনাকে দিয়েছিলাম। একবার যে নটিলাসে ঢোকে সে আর বাইরে যেতে পারে না।'

'তার মানে, আমাদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখতে চান আপনি?'

'সে আপনি যাই ভাবুন।'

'কিন্তু জানেন বোধহয়, ক্রীতদাসেরও তার স্বাধীনতা ফিরে পাবার অধিকার আছে।'

'থাকতে পারে। কিন্তু আমি আপনাদের দিয়ে তো কোন শপথ করিয়ে নিইনি।'

'এক কথা বার বার বলার ইচ্ছে নেই আমার, আপনারও তা ভাল লাগবে না। অধ্যয়ন বা গবেষণা আমার নেশার মত, যাতে ডুব দিলে আর সব কিছু ভুলে যাই আমি। আপনার মত আমার মনেও আশা আছে আমার এই গবেষণার ফল মৃত্যুর পর আমাকে অমর করে রাখবে। কিন্তু নেডের কথা আলাদা। তার কাছে এসব জ্ঞান চর্চার কোন দাম নেই। ঘরে ফেরার জন্যে যে রকম পাগল হয়ে উঠেছে সে, তাতে একদিন চেষ্টা করবে এখান থেকে—'

'নেড যদি কিছু চায় এবং তার জন্যে চেষ্টা করে, তো আমার কি এসে যায়? আমি তো তাকে খুঁজে পেতে আনিনি। আমার নিজের কাজে লাগানোর জন্যেও তাকে এখানে রাখিনি। প্রফেসর, এ নিয়ে দ্বিতীয় বার আর আপনার কাছ থেকে কোন কথা শুনতে চাই না।'

এরপর আর কথা চলে না। ফিরে এসে আমার দুই সঙ্গীকে সব কথা জানালাম।

'বুঝেছি,' নেড বলল, 'ওই লোকটার কাছে কিছুই পাব না আমরা। নটিলাস লং আইল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছে। আবহাওয়া যেমনই থাকুক ওখানেই চম্পট দেব আমরা।'

আস্তে আস্তে আকাশের অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। দিগন্তে একটু একটু করে মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে। ঝড়ের সঙ্গী একমাত্র পেট্রেল পাখি ছাড়া আর কোন পাখি দেখা গেল না। এটা প্রচণ্ড ঝড়ের পূর্বাভাস।

উনিশে মে লং আইল্যাণ্ডের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল নটিলাস। আর সেদিনই উন্মত্ত বিক্ষোভে সাগরের উপর ফেটে পড়ল ঝড়। দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে প্রথমে বইতে আরম্ভ করল বাতাস। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন। সাগরের পানি

উথলে উঠে তাঁর গায়ে গড়িয়ে পড়ল। আমিও প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম। কখনও কাত, কখনও সোজা হয়ে ঝড়ের তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল নটিলাস। পাঁচটায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। বিশাল ঢেউগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। এক একটা ঢেউয়ের উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট। যতই গভীর সাগরে এগিয়ে চললাম ততই ঢেউয়ের শক্তি ও আয়তন বাড়তে লাগল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার হয়ে উঠল ঝড়ের গতি। বহু দূরে একটা জাহাজকে ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনমতে টিকে থাকতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর আর দেখা গেল না জাহাজটা। রাত দশটায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। নটিলাসের চকচকে ইস্পাতের শরীরে ঝিকিয়ে উঠছে বিদ্যুতের ঝিলিক। অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। ঝড়ের অবস্থা তখন চরমে। আর টিকতে না পেরে গুঁড়ি মেরে সেলুন হলে এলাম। প্রায় বারোটায় ক্যাপ্টেন নিমোও নিচে নেমে এলেন। পানিতে ডুবতে শুরু করল নটিলাস। সেলুনের জানালা দিয়ে দেখা গেল বড় বড় মাছের দল ঝড়ের দাপটে দিশাহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে নামার পর দেখলাম সমুদ্রের চেহারা একেবারে শান্ত। আরও নিচে নামল নটিলাস। চারদিকে কি শান্তি, নিস্তব্ধতা! এখানে এসে কে বলবে যে ঠিক এই সময় সাগরের উপর হাজারো দৈত্যের তাণ্ডব নৃত্য চলছে।

আটাশ

এই প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে পুবদিকে চলতে হলো আমাদের। নিউ ইয়র্ক কিংবা সেন্ট লরেন্সের কাছ দিয়ে পালানোর আশা ঘুচে গেল। আরও মুষড়ে পড়ল নেড। ক্যাপ্টেনের মত সেও কথাবার্তা বন্ধ করে একলা একলা সময় কাটাতে লাগল। উত্তর পুবে এগিয়ে চলেছে নটিলাস। প্রথম ক'দিন পানির ওপর দিয়েই চলল। শেষে ভীষণ কুয়াশা জমায় বাধ্য হয়ে ডুবে চলতে হলো।

দিন কাটতেই থাকল। পয়লা জুন। সাগর সুন্দর, আকাশও পরিষ্কার। পুবদিকে প্রায় মাইল সাতেক দূরে একটা জাহাজ দেখা গেল। জাহাজে কোন পতাকা না থাকায় সেটা কোন দেশের বোঝা গেল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তখন নটিলাস।

ঠিক সেই সময় বুম্ করে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন।

'ওটা কিসের আওয়াজ, ক্যাপ্টেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

উত্তর দিলেন না ক্যাপ্টেন। প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে নেমে গেলেন।

কয়েক সেকেণ্ড পরই প্ল্যাটফর্মে উঠে এল নেড আর কনসীল।

'আওয়াজটা শুনেছ, নেড?' নেডকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শুনেছি। কামান দাগার আওয়াজ ওটা।' উত্তর দিল নেড।

জাহাজটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম গতি বাড়াচ্ছে ওটা। আরও প্রায় মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে।

'এটা কি জাহাজ, নেড?'

'চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধ জাহাজ। আরও কাছে এসে ওটা যদি এই হতচ্ছাড়া নটিলাসকে ডুবিয়ে দেয় তো দারুণ হয়!'

'নেড,' কনসীল বলল, 'রাগের মাথায় বলছ বটে একথা, কিন্তু ভেবে দেখো, জাহাজটা কি ক্ষতি করতে পারবে নটিলাসের? পানির তলায় কামান দাগতে পারবে?'

'নেড, ভাল করে দেখো তো জাহাজটা কোন্ দেশের?' বললাম আমি।

ভুরু কুঁচকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে বলল নেড, 'বোঝা যাচ্ছে না, কেননা কোন পতাকা লাগায়নি জাহাজটা। তবে সবচে বড় মাস্তুলটার মাথায় আটকানো ছোট্ট নিশানটা দেখে বোঝা যাচ্ছে ওটা যুদ্ধ জাহাজ।'

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে জাহাজটার ওপর লক্ষ রাখলাম। ধীরে ধীরে এগিয়েই আসছে ওটা। আমার মনে হচ্ছে নটিলাসকে দেখতে পাচ্ছে না জাহাজটা। জাহাজের দুটো বড় বড় চুঙ্গি দিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বেশ জোরেই আসছে ওটা। নটিলাসকে এখান থেকে সরিয়ে না দিলে আমাদের মুক্তির একটা উপায় হতে পারে।

'জাহাজটা যদি নটিলাসের এক মাইলের মধ্যে আসে, তাহলেও ঝাঁপ দেব আমি সাগরে।' বলল নেড, 'আর আপনাদেরকেও তাই করতে বলব।'

নেডের কথার কোন জবাব না দিয়ে ভাবতে থাকলাম আমি। জাহাজটা ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া—যেখানকারই হোক না কেন, একবার যদি ওটাতে গিয়ে উঠতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেশে নিয়ে যেতে অস্বীকার করবে না ওটা। হঠাৎ জাহাজের সামনের দিকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই নটিলাসের পাশে পানিতে ভারি কিছু একটা এসে পড়ল। আরও কয়েক মুহূর্ত পরে বিকট আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড় হলো আমার।

'আরে, আমাদের তাক করেই যে কামান দাগছে ওরা!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

'হ্যাঁ,' বলল নেড, 'এই আজব জীবটাকে চিনতে পেরেছে ওরা, তাই কামান দাগছে।'

'কিন্তু এর ভেতর যে মানুষ আছে সেটাও নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছে ওরা?'

'বোধহয় সেজন্যেই আরও বেশি করে কামান দাগছে।'

নেডের কথায় আমার মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। নিশ্চয়ই এখন আর বাইরের দুনিয়ার লোক সেই অতিকায় দানবের আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করে না। 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' থেকে নেডল্যাণ্ড যখন নটিলাসকে হারপুন ছুঁড়ে মেরেছে তখনই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যাকে নারহোয়েল ভাবছেন সেটা আসলে একটা ডুবোজাহাজ। তিনি বুঝেছিলেন এ ধরনের ডুবোজাহাজ নারহোয়েলের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ঙ্কর। কোনরকমে হয়তো দেশে ফিরতে পেরেছিলেন তিনি। আর হয়তো সে কারণেই পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশ এই ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রটিকে খুঁজে বার করার জন্যে সাগরময় সন্ধান করে ফিরছে। ক্যাপ্টেন নিমোও তো নটিলাসকে তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে লাগাতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক মাস আগের ঘটনাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। যে রাতে ক্যাপ্টেন আমাদের তিনজনকে একটা ঘরে বন্দী করে রেখেছিলেন, নিশ্চয়ই সেদিন তিনি কোন

জাহাজকে আক্রমণ করেছিলেন। প্রবাল স্তূপে সমাধিস্থ নাবিকটা বোধহয় এই সংঘর্ষেই আহত হয়ে মারা গেছে। আর বোধহয় কি, নিশ্চয়ই তাই। ক্যাপ্টেন নিমোর জীবনের একটা দিক পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে, কিন্তু তাঁর আসল পরিচয় কি? এটুকু বোঝা যায় কাল্পনিক দৈত্যদানব তিনি নন, যারা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই সভ্য সমাজেরই এক ঘোর বিদ্বেষী।

ভালমতই বুঝলাম ওই জাহাজের লোকেরা আর আমাদের বন্ধু নয়, নটিলাসে বাস করছি বলে আমরাও ওদের শত্রু। আমাদের চারপাশে একনাগাড়ে গোলা বর্ষিত হচ্ছে। এক একটা গোলা পানিতে পড়ছে আর সাগরের পানি ছিটকে লাফিয়ে উঠছে উপরে। জাহাজটা তখন নটিলাস থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে। এত গোলা বর্ষিত হওয়া সত্ত্বেও প্ল্যাটফর্মে ফিরে এলেন না ক্যাপ্টেন। ক্রমেই অবস্থা জটিল হয়ে উঠছে। হঠাৎ নেড বলল, 'প্রফেসর, এ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে একটা কিছু তো করা দরকার।'

'কি করতে চাও?'

'আমরা ওদের কাছে আসার সঙ্কেত দিই, যাতে ওরা বুঝতে পারে আমরা নিরপরাধ।'

পকেট থেকে রুমাল বার করল সে। কিন্তু রুমালটা উড়াতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে কার প্রচণ্ড ঘুসি খেয়ে ডেকে গড়িয়ে পড়ল নেড। চমকে পেছনে ফিরে ক্যাপ্টেন নিমোকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম।

'নির্বোধ,' দাঁতে দাঁত ঘষে গর্জন করে উঠলেন তিনি, 'তুই কি চাস ওই জাহাজটাকে শেষ করার আগে নটিলাসের তীক্ষ্ণ খড়্গ দিয়ে তোকে গেঁথে ফেলি?'

মড়ার মুখের মত সাদা হয়ে গেছে ক্যাপ্টেনের মুখ। শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে দ্রুত ওঠানামা করছে বুক। নেডকে ছেড়ে ওই যুদ্ধজাহাজটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'অভিশপ্ত জাহাজ। পতাকা না থাকলেও তোর পরিচয় জানি আমি। লাগতেই যখন এসেছিস, দেখ আমার যুদ্ধ নিশান।'

জাহাজের সম্মুখভাগে একটা কালো পতাকা লাগিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন। ঠিক এরকম পতাকাই তিনি দক্ষিণ সাগরে উড়িয়েছিলেন। এমনি সময়ে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত একটা গোলা তির্যকভাবে নটিলাসের গায়ে প্রতিহত হয়ে পানিতে গিয়ে পড়ল।

সেদিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। আমাদের দিকে ফিরে বললেন, 'যান সঙ্গীদের নিয়ে নিচে যান, এখুনি—'

'ক্যাপ্টেন,' উত্তেজিতভাবে বললাম আমি, 'জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন আপনি?'

'না। ডুবাব।'

'সত্যিই তা করবেন আপনি?'

'করব।' দৃঢ় গলায় বললেন ক্যাপ্টেন, 'আর আপনাকে বলছি, আমার কাজের বিচার করতে আসবেন না। আমার সামান্য ভুলে আপনারা যা দেখে ফেলেছেন সেটা দেখতে দেয়া ভুল হয়েছে আমার। হয়েছে, নিচে যান এবার। আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে।'

'কোন দেশী জাহাজ ওটা?'

'জানেন না? ভাল! কোন্ দেশের জাহাজ ওটা আপনার না জানাটাই ভাল।

কিন্তু আর একটা কথাও না। নিচে নামুন।'

তাঁর আদেশ না মেনে উপায় নেই। প্রায় পনেরো জন নাবিক ক্যাপ্টেনকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটার দিকে চেয়ে আছে ওরা। প্রত্যেক জোড়া চোখ থেকে ঝরছে তীব্র ঘৃণা। পরিষ্কার বুঝলাম প্রতিহিংসায় জ্বলছে সব ক'জন। নিচে নামার সিঁড়িতে পা দিতেই আরও একটা গোলা নটিলাসের গায়ে এসে লাগল। সাথে সাথে শোনা গেল ক্যাপ্টেনের উন্মাদ চিৎকার, 'তোদের যেভাবে খুশি চেষ্টা কর, হারামজাদারা। তারপর? নটিলাসের হাত থেকে পালাবি কোথায়?'

সোজা আমার ঘরে চলে এলাম। চলতে শুরু করল নটিলাস। অল্প সময়েই জাহাজের নাগালের বাইরে চলে গেল। কিন্তু থামলেন না ক্যাপ্টেন, ওই জাহাজকে পেছনে ফেলে আরও এগিয়ে চললেন।

বিকেল চারটে বাজল। আর থাকতে না পেরে মাঝখানের সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ঢাকনিটা খোলাই ছিল। একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত চলেই এলাম প্ল্যাটফর্মে। তখনও উত্তেজিতভাবে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করছেন ক্যাপ্টেন। জাহাজটা তখন নটিলাস থেকে পাঁচ-ছ' মাইল দূরে।

ক্রুদ্ধ একটা জানোয়ারের মত জাহাজটার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে তাকে পুবদিকে টেনে নিচ্ছে নটিলাস। কিন্তু কিছুতেই জাহাজটাকে আক্রমণ করলেন না ক্যাপ্টেন। তাঁর এ দ্বিধার কারণও বুঝলাম না। ইচ্ছে হলো ক্যাপ্টেনের সাথে কথা বলি। কিন্তু আমার আগেই বলে উঠলেন তিনি, 'এখানে আমি বিচারক, আমার কথাই এখানে আইন। আমার ওপর অনেক অত্যাচার করেছে ওরা।' জাহাজটাকে নির্দেশ করে বললেন ক্যাপ্টেন, 'ওদের জন্যেই আজ আমার আত্মীয়-স্বজন, দেশ সব হারিয়েছি। ওদের আমি ধ্বংস করব।'

শেষবারের মত একবার জাহাজটার দিকে তাকিয়ে নিচে কনসীল আর নেডের কাছে চলে এলাম। তাদের বললাম, 'যে করেই হোক এখান থেকে পালাব আমরা।'

'খুব ভাল কথা, প্রফেসর।' আমার কথায় দারুণ খুশি হলো নেড, 'কিন্তু জাহাজটা কাদের?'

'জানি না। তবে যে দেশেরই হোক রাতের আগেই সেটাকে ডুবিয়ে দেবেন ক্যাপ্টেন। নটিলাসে থেকে এত বড় অন্যায়ের ভাগীদার হওয়ার চাইতে জাহাজটার সাথে ডুবে মরাই ভাল।'

'আপনার সাথে একমত আমি। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

ধীরে ধীরে রাত নামল সাগরের বুকে। সমস্ত ডুবো জাহাজটায় এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজমান। কম্পাস দেখে বোঝা গেল পুবদিকেই চলছে নটিলাস। তিনজনেই ঠিক করলাম নটিলাস জাহাজটার কাছাকাছি হলেই পালাব আমরা। জাহাজে পৌঁছে তাকে নটিলাসের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে না পারলেও প্রাণপণ চেষ্টা করব। কিন্তু জাহাজটা খুব বেশি কাছে আসার আগেই সরে যাচ্ছে নটিলাস।

সময় কাটতে থাকল। সুযোগের সন্ধানে আছি আমরা। উত্তেজনায় প্রায় কাঁপছি আমরা তিনজন। নেড তো সাগরে ঝাঁপ দেয়ার জন্যে একেবারে তৈরি।

রাত তিনটায় উদ্বিগ্নভাবে প্ল্যাটফর্মে উঠে এলাম। প্ল্যাটফর্ম থেকে নামেননি ক্যাপ্টেন। জাহাজের সামনের নিশানটার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাওয়ায় মাথার চুল উড়ছে তাঁর। তখনও তিনি একভাবে জাহাজটার দিকে তাকিয়ে।

আকাশের একপাশে ঢলে পড়েছে চাঁদ। পুব দিকে সবে উঠেছে বৃহস্পতি, অপূর্ব দেখাচ্ছে আকাশ আর সাগরের তখনকার রূপ। বাইরে এত প্রশান্তি, অথচ নটিলাসের ভেতরে কত উত্তেজনা, কত হিংসা, কত দ্বেষ!

জাহাজ তখন নটিলাস থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে। আস্তে আস্তে নটিলাসের আলোক সীমানার কাছে এগিয়ে আসছে ওটা। জাহাজটার মাস্তুলের সবুজ আলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ভোর চারটে পর্যন্ত একইভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। এর মাঝে একবারও আমাকে দেখেননি ক্যাপ্টেন। একটু পরই আকাশে ভোরের আলো ফুটবে। আরও আধ মাইল এগিয়ে এসেছে জাহাজটা। আবার শুরু হয়েছে গোলা বর্ষণ। আমার মনে হলো শীঘ্রিই জাহাজটাকে আক্রমণ করবে নটিলাস। আর সঙ্গীদের সাথে এই রহস্যময় লোকটাকে চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাব আমরা। নেড আর কনসীলকে 'সময় হয়েছে' বলার জন্যে নিচে নামতে যাচ্ছি, সেই সময় কয়েকজন নাবিক সহ উপরে উঠে এলেন সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট। সোজা নিচে নেমে সেলুনে গিয়ে ঢুকলাম।

ভোর পাঁচটায় স্পিডোমিটারে দেখলাম গতি কমাচ্ছে নটিলাস—তার মানে আক্রমণের জন্যে তৈরি হচ্ছেন ক্যাপ্টেন।

'শুনছ, নেড,' বললাম আমি, 'সুযোগ তো এসেছে। খোদাই জানেন এরপর কি হবে!'

তৈরি হয়েই আছে নেড। কোন ভাবান্তর নেই কনসীলের। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল আমার। তিনজনেই লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু সিঁড়িতে ওঠার দরজাটা খোলার সাথে সাথে উপরের ঢাকনি বন্ধ হওয়ার আওয়াজ শোনা গেল। সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল নেড, কিন্তু কোনমতে আটকালাম ওকে। দেরি হয়ে গেছে আমাদের। জাহাজটাকে পানির নিচ দিয়ে গিয়ে আঘাত করবে নটিলাস।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবার বন্দী হলাম। ওই ভয়ঙ্কর, করুণ নাটকের দর্শক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনজনেই আমার ঘরে চলে এলাম। মনটা অসাড় হয়ে গেছে আমার। প্রত্যেকটা সামান্যতম আওয়াজও কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। দ্রুত হয়ে যাচ্ছে নটিলাসের গতি। তীরবেগে ছুটতে শুরু করল সে। হঠাৎ প্রচণ্ড সংঘর্ষে থরথর করে কেঁপে উঠল নটিলাস। কাপড়ের ভেতরে সূচ ঢোকার মতই অতি সহজে নটিলাসের খড়্গ ঢুকে গেছে জাহাজটার তলায়।

আর সহ্য করতে পারলাম না। পাগলের মত ঘর থেকে বেরিয়ে সেলুনে ঢুকলাম। ক্যাপ্টেনও আছেন সেখানে। থমথমে গাম্ভীর্যের সাথে একটু বিষাদও যেন লেগে রয়েছে তাঁর চেহারায়। কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছেন তিনি। জানালা দিয়ে একটা বিরাট ছায়া দেখা গেল। দশ গজ দূরে যুদ্ধজাহাজটার তলার ফাটলটা দেখা যাচ্ছে। হু হু করে পানি ঢুকছে জাহাজের ভেতর। এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ভীতু মাছের দল। নির্বাক বিস্ময়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে এ দৃশ্য দেখলাম। কি এক অজানা আতঙ্কে ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে উঠল আমার। চোখের দৃষ্টি যেন ওই কাঁচের জানালার সাথে আঠার মত সেঁটে গেছে। ভেতরের হাওয়ার চাপে বিস্ফোরিত হয়ে জাহাজের ডেকটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল। আরও তাড়াতাড়ি ডুবতে শুরু করল হতভাগ্য জাহাজটা। একে একে ওটার মাস্তুল,

www.alorpathsala.org

দড়িদড়া তলিয়ে যেতে দেখলাম। জাহাজের নাবিকরা বাঁচার তাগিদে মাস্তুলটাকেই আঁকড়ে ধরেছে। কয়েকজন সাঁতার কাটছে এদিক ওদিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারল না একজনও। রক্তের গন্ধে হাজির হয়ে গেছে হাঙ্গরের দল।

এবার ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালাম। কি ভয়ানক প্রতিহিংসাপরায়ণ ওই লোকটা। ঘৃণা আর বিদ্বেষ তাঁর মনটাকে পাথর করে ফেলেছে। সব শেষ হয়ে গেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। গভীর কৌতূহলে তাঁর পিছু নিলাম। ঘরের দেয়ালের শেষদিকে তাঁর পূজনীয় লোকদের প্রতিকৃতির মধ্যে একজন যুবতী ও দুটি শিশুর ছবি দেখলাম। কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। তারপর তাদের দিকে হাত দুটো প্রসারিত করে হু হু শব্দে কেঁদে উঠলেন ওই নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষটা।

ঝমাঝম সব ক'টা জানালা বন্ধ করে দেয়া হলো নটিলাসের। জাহাজের ভেতর গাঢ় অন্ধকার থমথম করতে লাগল। কোথাও জীবনের লক্ষণ নেই। পানির প্রায় একশো ফুট নিচ দিয়ে তীরবেগে ছুটছে নটিলাস। যেন ওই ভয়ঙ্কর এলাকা ছেড়ে পালাতে চাইছে।

ঘরে ফিরে এলাম। চুপচাপ বসে আছে নেড-কনসীল। ক্যাপ্টেন নিমোর চরিত্রের এই নৃশংস দিকটা আমার অজানা ছিল। স্বীকার করছি তাঁর প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, কিন্তু তাহলেও কি এতগুলো নিরপরাধ মানুষকে প্রাণে মেরে ফেলাটা উচিত হয়েছে তাঁর? তাঁর এই ভয়ঙ্কর অপরাধ, এই নিষ্ঠুরতাকে নিজের চোখে দেখেছি, তাঁর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সাক্ষী আমি।

এগারোটায় আলো জ্বললে সেলুনে এসে ঢুকলাম। কেউ নেই সেখানে। যন্ত্রপাতি দেখে বুঝলাম নটিলাস উত্তর দিকে ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ছুটছে। তার মানে নটিলাসের লক্ষ্য এখন উত্তর সাগর। সেদিন রাতে সাড়ে ছ'শ মাইল এগিয়ে গেল নটিলাস।

বিছানায় শুয়েও কিছুতেই ঘুম এল না চোখে, কেবলই ওই ভয়ানক দৃশ্য আর নানা দুশ্চিন্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চোখের সামনে ভেসে বেড়াল। আর কতদিন চলবে এ সাগর পরিক্রমা? কোন দিন শেষ হবে কি এর? ক্যাপ্টেন নিমো বা তাঁর কোন লোকের দেখা পাচ্ছি না ক'দিন ধরে। একটানা পানির নিচ দিয়েই যাচ্ছে নটিলাস। শুধু তাজা বাতাসের দরকার হলেই ভেসে উঠছে, প্রয়োজন মিটে গেলেই ডুব দিচ্ছে আবার। নেডেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আমি বা কনসীল অনেক চেষ্টা করেও একটা কথা বের করতে পারছি না ওর মুখ থেকে। হতাশায় আত্মহত্যা করে বসবে নাকি নেড?

একদিন সকালে, মাস বা দিন হিসেব নেই তখন আর, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আমি। হঠাৎ কার ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখলাম মুখের ওপর ঝুঁকে আছে নেড। আমার ঘুম ভাঙতেই ফিসফিস করে বলল সে, 'এখান থেকে পালাচ্ছি আমরা।'

এক লাফে উঠে বসলাম বিছানায়।

'কখন?'

'আজ রাতে। নটিলাসের পাহারা বন্ধ হয়ে গেছে। কি রকম বোকা হয়ে গেছে সবাই। এইই সুযোগ!'

'নিশ্চয়ই! কিন্তু আমরা আছি কোথায়?'

'ডাঙার কাছাকাছিই। আজ সকালে কুয়াশার ফাঁকে তীরের দেখা পেয়েছি। পুবদিকে, মাইল বিশেক দূরে।'

'কোন দেশ?'

'জানি না। তবে যে দেশই হোক ওখানেই আশ্রয় নেব আমরা।'

'হ্যাঁ, নেড, যাব আমরা।' আমার সমস্ত মন এই শেকল ভাঙার জন্যে উতলা হয়ে উঠল, 'আজই পালাব আমরা। আর তা করতে গিয়ে যদি সাগরে ডুবেও মরি তাহলেও পরোয়া নেই।'

'সাগরের অবস্থা ভাল না এখন, তবে নটিলাসের নৌকায় করে অনায়াসে বিশ মাইল পথ পাড়ি দিতে পারব আমরা। ওদের অজান্তে কিছু খাবার আর কয়েক বোতল পানি সরিয়ে ফেলেছি আমি।' তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল নেড, 'যদি ধরা পড়ি, লড়ব ওদের সাথে। জীবন্ত আর ধরা দিচ্ছি না আমি।'

'তাই হবে, নেড, মরলে এক সাথেই মরব।'

নেড চলে গেলে একবার প্ল্যাটফর্মে উঠলাম আমি। আকাশের অবস্থা ভয়ঙ্কর। নেডের কথা সত্যি, দূরে উপকূল দেখা যাচ্ছে। আর নয়, এবার পালাতেই হবে। সেলুনে এসে ঢুকলাম। অত্যন্ত দীর্ঘ মনে হচ্ছে আজকের দিনটা। সন্ধ্যা ছ'টায় খিদে না পেলেও কিছু খেয়ে নিলাম। ঠিক সাড়ে ছ'টায় নেড আমার ঘরে এসে বলল, রওনা দেবার আগে আর তার সাথে দেখা হবে না। চাঁদ উঠবে রাত দশটার পর, তার আগেই অন্ধকারে পালাতে হবে। ঠিক হলো নেড আর কনসীল নৌকায় অপেক্ষা করবে, ঠিক দশটায় হাজির হয়ে যাব আমি।

ম্যাপ আর যন্ত্রপাতি দেখে বুঝলাম পঞ্চাশ গজ নিচ দিয়ে যাচ্ছি। জানালা দিয়ে শেষবারের মত প্রকৃতির ওই সৌন্দর্যের দিকে তাকালাম। যে অমূল্য সব জিনিস পড়ে আছে এখানে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাদুঘরেও তার কণা মাত্র নেই। কোনদিন এর কথা ভুলব না আমি। এ অনন্ত রাজ্যের স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে আমার মনে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দেখলাম ওই আশ্চর্য, জীবন্ত জাদুঘর। তারপর নিজের ঘরে ফিরে এলাম।

মজবুত কাপড়ের পোশাক পরে তৈরি হয়ে এতদিনকার লেখা সব কাগজপত্র গুছিয়ে নিলাম। বুকের ভেতরটা কাঁপছে। ক্যাপ্টেন যদি এ অবস্থায় দেখে ফেলেন আমাকে? তার ঘরের দরজায় কান পেতে শুনলাম, কেউ পায়চারি করছে ভেতরে। ঘরেই আছে ক্যাপ্টেন। হঠাৎ যদি তিনি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন কোথায় যাচ্ছি, কি বলব? ক্যাপ্টেনের সাথে শেষবারের মত দেখা করার একটা অদম্য ইচ্ছা জাগল মনে। কিন্তু সেটা হবে পাগলামির নামান্তর। জোর করে ইচ্ছেটা দমন করে, বিছানায় গিয়ে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে গত ক'মাসের ঘটনাগুলো, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনে চড়ে সমুদ্রযাত্রা থেকে আরম্ভ করে, টোরেস প্রণালী, পাপুয়া দ্বীপের অসভ্যরা, প্রবাল স্তূপের সমাধি, লঙ্কাদ্বীপের সাগর তলায় হাঙ্গরের সাথে লড়াই—সব, সব ছায়াছবির মত ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়।

এক সময় সাড়ে ন'টা বেজে গেল। দু'হাতে মাথা চেপে, চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। খোদা, এভাবে আর দোটানায় ফেলো না আমাকে। আর শুধু মাত্র আধ ঘণ্টা। তারপরেই নটিলাসের সাথে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হবে আমার।

এমন সময় বেজে উঠল অর্গ্যান। একটা দুঃখের সুর, যেন পৃথিবীর সাথে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করা মানুষের করুণ কান্না মাথা কুটে মরছে নটিলাসের লোহার

দেয়ালে দেয়ালে। এ সুরের মাঝে তাঁর কোন্ অব্যক্ত ব্যথাকে রূপ দিতে চাইছেন ক্যাপ্টেন?

হঠাৎ চমকে উঠলাম। অর্গ্যানটা থাকে সেলুনে। নিশ্চয়ই সেলুনে বসেই সঙ্গীতে ডুবে আছেন ক্যাপ্টেন। পালাবার সময় সেলুনটা পেরিয়ে যেতে হবে আমাকে। কি করে যাব?

প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। এখন আর দ্বিধা করার সময় নেই। আস্তে করে আমার ঘরের দরজা খুললাম। ক্যাঁচ করে সামান্য আওয়াজ হলো কব্জায়। কিন্তু সেটাই ভীষণ আওয়াজ মনে হলো আমার কাছে।

পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম। বুকের ভেতর ধুক্‌পুক্ করছে হৃৎপিণ্ডটা। সেলুনের কাছে গিয়ে আলতোভাবে দরজাটা খুললাম। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। অন্ধকারেই বাজছে অর্গ্যান। সঙ্গীতে এত তন্ময় হয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন, আমার উপস্থিতি বুঝতেই পারেননি। কার্পেট পাতা মেঝের ওপর দিয়ে গুঁড়ি মেরে হেঁটে গেলাম। ওইটুকু পেরিয়ে অন্য পাশের দরজার কাছে পৌঁছতেই মিনিট পাঁচেক লেগে গেল।

দরজাটা খুলতে যাব, এমন সময় ক্যাপ্টেনের গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনে মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালাম। থেমে গেছে অর্গ্যানের সুর। ততক্ষণে দরজাটা খুলে ফেলেছি আমি। হঠাৎ আবেগে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি, 'প্রভু, অনেক হয়েছে! আর না—'

এ কি তাঁর অনুশোচনা? বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে এভাবেই কি তিনি সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন?

কিন্তু আমার সময় নেই। চোখ কান বুজে লাইব্রেরি পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে কোনরকমে নৌকায় এসে পৌঁছলাম। নেড আর কনসীল আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছে।

'জলদি নৌকা ছাড়ো,' চাপাকণ্ঠে বললাম আমি।

'এই যে, ছাড়ছি,' জবাব দিল নেড।

নৌকার বাঁধনটা খুলতে যাচ্ছে নেড, এমন সময় নটিলাসের ভেতরে একটা গোলমাল শোনা গেল। কারও চিৎকারও শুনতে পেলাম। ব্যাপার কি? ওরা কি জেনে গেছে আমরা পালাচ্ছি?

নিঃশব্দে আমার হাতে একটা ছুরি গুঁজে দিল নেড।

'হ্যাঁ,' দৃঢ় স্বরে বললাম আমি, 'আমরা জানি কিভাবে মরতে হয়।'

নটিলাসের সব নাবিকই একই কথা বলে চেঁচাচ্ছে। হঠাৎ বুঝলাম তাদের চেঁচানোর কারণ আমরা নই। অন্য জিনিসের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

'ঘূর্ণি! ঘূর্ণি!' বলে চেঁচাচ্ছে ওরা।

নরওয়ের এ অঞ্চলে ঘূর্ণি বা জলাবর্ত যে কি ভয়ঙ্কর তা সবাই জানে। চেয়ে দেখলাম, হু হু শব্দে বিশাল সব ঢেউ ছুটে আসছে চারদিক থেকে। সাগরের মাঝখানে এসে সেই পানিরাশি প্রবল বেগে ঘুরছে। এ ঘূর্ণির বিস্তার বারো মাইল। এর টানে শুধু জাহাজ নয়—তিমি, এমন কি উত্তরাঞ্চলের সাদা ভালুক পর্যন্ত প্রাণ হারায়।

উত্তরেই যাচ্ছে নটিলাস। নৌকাটা তখনও নটিলাসের সঙ্গে বাঁধা। ভয়ে,

আতঙ্কে জান উড়ে গেল আমার। ঘামে নেয়ে উঠেছে সারা গা। পাথরের উপর প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে বিশাল ঢেউ। বড় বড় গাছপালা থেকে শুরু করে সামনে যা কিছু পাচ্ছে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই উন্মাদ ঘূর্ণি।

এই ঘূর্ণির সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছে নটিলাস। মনে হচ্ছে পাক খেতে খেতে খাড়াভাবে তলিয়ে যাবে ডুবোজাহাজটা আর তার সাথে আমরাও।

'শক্ত করে ধরুন,' চেঁচিয়ে বলল নেড, 'নটিলাসকে আঁকড়ে থাকতে পারলে হয়তো বেঁচে যেতেও পারি—'

তার কথা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড শব্দে কান ফেটে যাবার জোগাড় হলো। আমাদের নৌকা নটিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শাঁ করে ছুটল ঘূর্ণির দিকে।

হঠাৎ কিসের সাথে আমার মাথা ঠুকে গেল। সাথে সাথে জ্ঞান হারালাম আমি।

উনত্রিশ

জ্ঞান হতে দেখলাম এক জেলের কুটিরে শুয়ে আছি। আমার দু'হাত ধরে দু'পাশে বসে আছে নেড আর কনসীল। লাফ দিয়ে উঠে বসে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলাম। আহ্! মুক্তির সে কি আনন্দ!

জায়গাটা লফোডন দ্বীপপুঞ্জ। নরওয়ের উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার ব্যবস্থা মোটেই ভাল নয়। ফ্রান্সে ফিরে যেতে হলে কেপ নর্থের যে স্টীমারটা মাসে একবার ওদিকে যায় সেটার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এখানেই আমার এ কাহিনীর শেষ। এ কাহিনী লোকে বিশ্বাস করুক বা না করুক আমার কিছু যায় আসে না। দু'মাসেরও কম সময়ে সাগরের বিশ হাজার লীগ ঘুরে এসেছি আমি। সেই সাগর আর তার নিচের বিচিত্র জগৎ সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু নটিলাসের কি হলো? ঘূর্ণির প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে কি সে এখনও টিকে আছে? এখনও সাগরের তলায় থেকে তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে চলেছেন ক্যাপ্টেন? না কি সে নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর সে উন্মাদনা ঘুচে গেছে?

যদি বেঁচে থাকেন ক্যাপ্টেন নিমো, তাহলে খোদা যেন তাঁর মন থেকে ঘৃণাকে চিরতরে দূর করে দেন। তাঁর মধ্যে জিঘাংসা চরিতার্থ করার চেয়ে দার্শনিক চিন্তাধারাই যেন বড় হয়ে দেখা দেয়। অদ্ভুত হলেও এমন মহৎ চরিত্র কমই দেখেছি আমি।

ক্যাপ্টেন নিমোর নটিলাসে থেকে এক গভীর সত্যের সন্ধান পেয়েছি আমি। নিঃসীম সাগরের অতল গভীরে ডুব না দিলে যে সত্যকে উপলব্ধি করা যায় না।